২৭ নভেম্বর ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

কলকাকলি

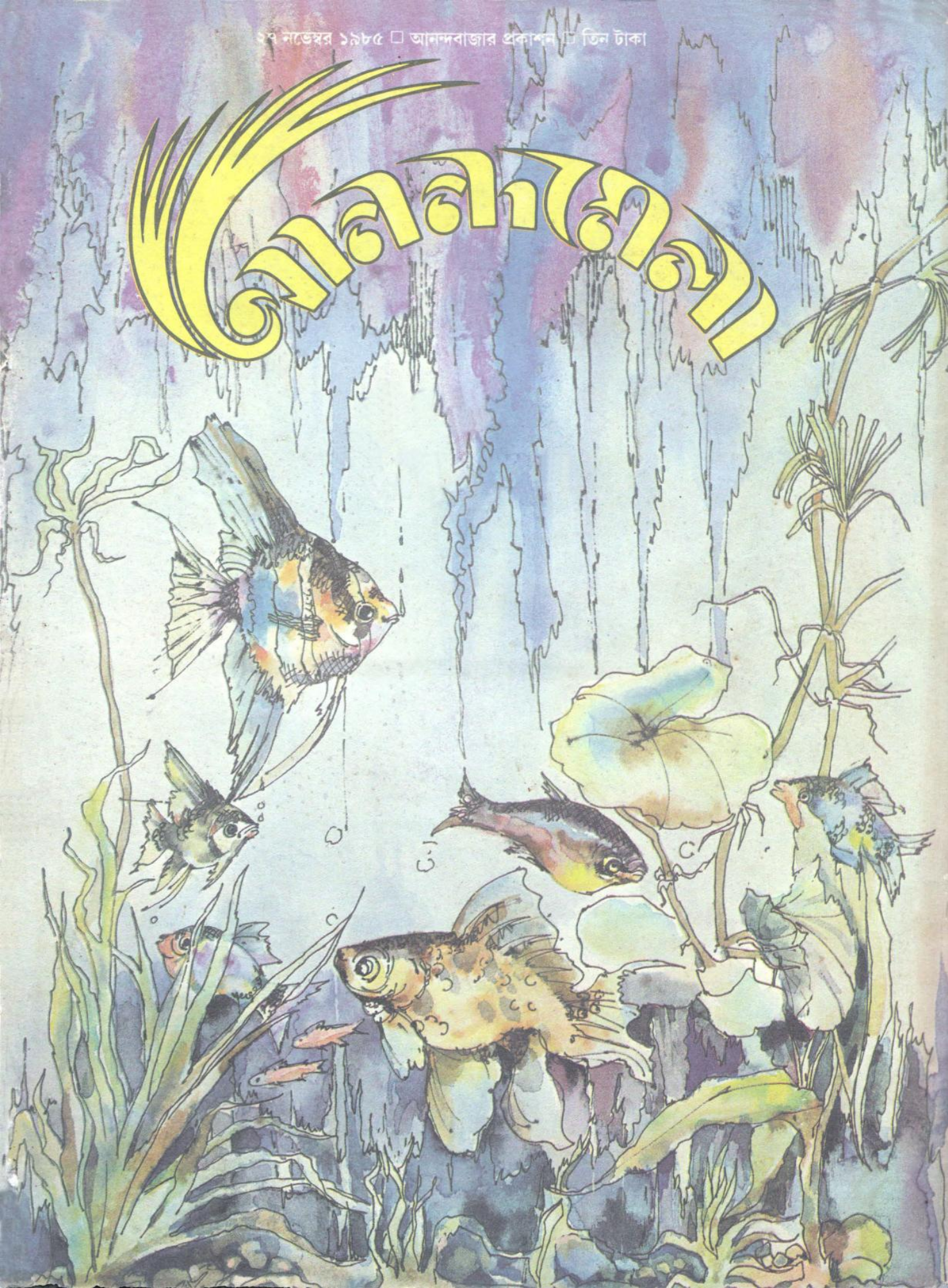

CLARION/NC/8572

আনন্দমেলা

১১ অগ্রহায়ণ ১৩৯২ ।। ২৭ নভেম্বর ১৯৮৫ ।। ১১ বর্ষ ১৭ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ছদ্মবেশী দোকানদার । তুলসী সেনগুপ্ত ৩৩

গল্প

ডনের বাঘ । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৩

বন্ধুর নাম পিপড়ে । অধীর বিশ্বাস ১৮

উৎসবের দিন । বাণী বসু ২৫

বিশেষ রচনা

বাবুই ও তার আশ্চর্য বাসা । শান্তনু ঘোষ ৯

জীবন্ত ফসিল : ওকাপি আর জিরাফ । উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১৬

ধারাবাহিক উপন্যাস

শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ৫১

গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫৬

ছড়া

মামার কুকুর । শৈলেনকুমার দত্ত ৩১

ভূতের গল্প । সুভাষপ্রসন্ন ঘোষ ৩১

চিকিচ্ছে । শেখর আহ্‌মেদ ৩১

বিজ্ঞানবিচিত্রা

এলাম আমি কোথা থেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫

জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ১৫

শার্লক হোমসের গল্প

বস্কোম্ব ভ্যালিতে খুন । সার আর্থার কোনান ডয়েল ২৮

লেখাপড়া

ঋষভ···অঙ্গুষ্ঠ (অর্থ জানো) । দেব সেনাপতি ৭

চামেলির প্রশ্ন (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ৭

ডাক্তারবাবু বলছেন

হেমন্তকালের খাওয়াদাওয়া । (ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ৫৫

খেলাধুলো

বরদলুই ট্রফি মহমেডানের । অশোক রায় ৬২

ইস্টবেঙ্গলের পুজো বোনাস । সুব্রত সিংহ ৬৩

দলীপ ট্রফি পশ্চিমাঞ্চলের । বজ্রসেন ৬৫

সবচেয়ে বিপজ্জনক স্ট্রাইকার । মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিকস

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩২,
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬১

অন্যান্য আকর্ষণ

তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : নন্দিতা মিত্র

সম্পাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

সব শিশুরই
এক সুর
গেঞ্জি পরুন
কোহিনুর

কোহিনুর নিটিং মিলস্
গেঞ্জি ● জাঙ্গিয়া
প্রস্তুতকারক

বাংলাদেশে আইনসম্মতভাবে বিক্রির জন্য প্রতি
জেলায় ডিস্ট্রিবিউটার আবশ্যক ।

যোগাযোগ কেন্দ্র :
কোহিনুর নিটিং মিলস্
১১৩ মনোহর দাস কাটরা, কলিকাতা-৭০০০০৭

জনসন্স বেবী লোশন
কেননা নরম ত্বক
আপনার বয়সকে গোপন করে রাখে

জনসন্স বেবী লোশন

একটি কোমল, গোলাপী লোশন... ত্বককে কোমল রাখার ইমোলিয়েন্ট-এর মিশ্রণ যা আপনার ত্বকের নিজস্ব আর্দ্রতা বজায় রাখার তরল পদার্থের মতই কাজ করে।

তরুণ ত্বকে এই তরল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকায় এটি আপনার স্বাভাবিক কোমলতা ও নমনীয়তা বজায় রাখে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ত্বককে কোমল রাখার প্রাকৃতিক ইমোলিয়েন্ট শুকিয়ে যেতে শুরু করে।

আপনার ত্বক তেলতেলে হলেও এমনটি হতে পারে। কেননা আপনার ত্বকের কোমলতা নির্ভর করে শুধুই তার আর্দ্রতার ওপর। তেলতেলে শুকনো হওয়ার উপর নয়।

আপনার ত্বক যে রকমই হোক না কেন, জনসন্স বেবী লোশন আপনার ত্বকের নিজস্ব স্বাভাবিক তরল পদার্থের সাথে একযোগে কাজ করে। তাতে আনে প্রাণের জোয়ার ও আপনার রঙরূপে পুষ্টি যোগায়।

একটুখানি জনসন্স বেবী লোশনে কাজ পাওয়া যায় অনেক। এটি তেলতেলে নয় এবং এটি আপনার ত্বকে এত দ্রুত শুষে যায় যে এর কাজ শুরু হওয়া আপনি অনুভব করবেন। এটি আপনার ত্বককে কোমল রাখবে।

বয়সের চেয়ে আপনাকে ছোট দেখাবে।

জনসন্স বেবী লোশন। আপনার ত্বক কিছুতেই আপনার বয়স প্রকাশ করতে পারবে না।

OBM/3726 BEN

মগজওয়ালা মাছ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এদিকে হল এক দারুণ কাণ্ড। নদীনালার স্বচ্ছ জলের নীচে কাদামাটির মধ্যে এমন এক প্রাণী দেখা দিল, যারা হল ভবিষ্যতের প্রকৃত দণ্ডধর। দেখতে একেবারেই গণ্যমান্য নয়। এইটুকু চ্যাপ্টা গড়ন। কুঁড়ের বাদ্‌শা।

কাদার ভেতর থেকে কৃমিকীট চুষে প্রাণধারণ করত। চোয়াল না থাকায় তার খাওয়ার উপায় ছিল না। মুখ বলতে তো শুধু হাঁ-করা একটা ফাটল। কিন্তু তার ছিল এমন দুটো জিনিস, যার জোরে সেকালের প্রাণীদের মধ্যে সে ছিল সবার অগ্রগণ্য।

এক, ছিল তার শক্ত খোলা।
দুই, ছিল সে মগজওলা॥

বৈজ্ঞানিকেরা এই-জাতীয় প্রাণীকে বলেন 'অস্ট্রাকোডার্ম্'— অর্থাৎ, খোলচামড়াওয়ালা মাছ। এর মাথার দিকটা বর্মের মতো শক্ত হাড় দিয়ে মোড়া। শরীরের বাকি অংশ ছিল আঁশে ভর্তি।

মাংসাশী জলবিছারা এদের খেয়ে ফেলতে পারেনি দুটো কারণে। প্রথমত, এদের রক্ষা করেছিল গায়ের শক্ত হাড়। দ্বিতীয়ত, মগজ থাকায় জেনেবুঝে এরা হাবাগোবা জলবিছাদের চোখে সহজেই ধুলো দিতে পারত।

এরপর কেটে গেল সাড়ে সাত কোটি বছর। ক্রমবিকাশের ধারা পুরোদমে আরও একধাপ এগিয়ে গেল। খোলচামড়াওয়ালা মাছের একটা দল থেকে গড়ে উঠল এক নতুন ধাঁচের মাছ। এদের ভেতর ফুটে উঠল ভবিষ্যতের এক নতুন সম্ভাবনা।

এই নতুন মাছের ছিল :

সত্যিকারের মেরুদণ্ড (অর্থাৎ কিনা, যাকে শরীরসহ মাংসপেশি আঁকড়ে ধরে থাকে), দুটি চোয়াল, পাখনা আর পেশিযুক্ত ল্যাজা, দ্রুত গতি, বড় বহর (অবশ্যক যা যা)।

এসব পাওয়ায় এদের দুটো বড় লাভ হল : এক, খুশিমতো চলে-ফিরে বেড়াবার স্বাধীনতা ; দুই, শত্রুর হাত থেকে গা বাঁচাবার উপায়। কেবল জলের নীচে কাদার মধ্যে মাথা গুঁজে না থেকে, এখন তারা যত্রতত্র ঘুরে খাবার খুঁটে খেতে পারে। পাখনা, ল্যাজা আর জল কাটার সুবিধেমতো গড়নের জোরে চট্ করে এখন তারা ছুটে পালাতে পারে। পূর্বপুরুষদের মতো শক্ত হাড়ের বর্ম না থেকেও আগের চেয়ে তারা এখন ঢের বেশি নিরাপদ।

দিন-দিন বেড়ে যেতে থাকে এই নতুন মাছের বংশ। ক্রমে নদীনালার ওপরকার টাটকা জল তারা ছেয়ে ফেলে। তারপর নদীনালা থেকে শুরু হয়ে যায় বিরাট বিরাট ঝাঁক বেঁধে এদের সমুদ্রযাত্রা।

পাঁচ কোটি বছর ধরে দেখা গেল, যেখানেই জল সেখানেই রকমারি সব মাছ। তাই এই সময়টাকে বলা হয় 'মাৎস্যযুগ'।

অস্ট্রাকোডার্ম-বংশের কয়েকটি মাছ

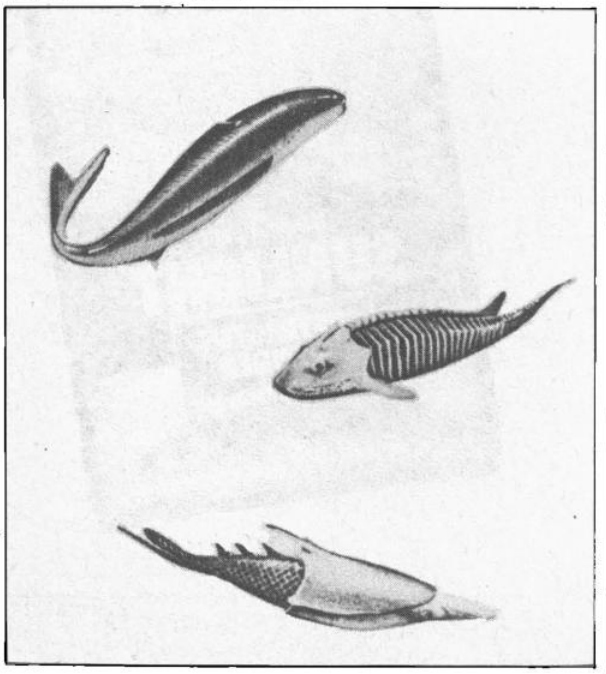

প্রাচীন পৃথিবীর সমুদ্রতলের কাল্পনিক চিত্র

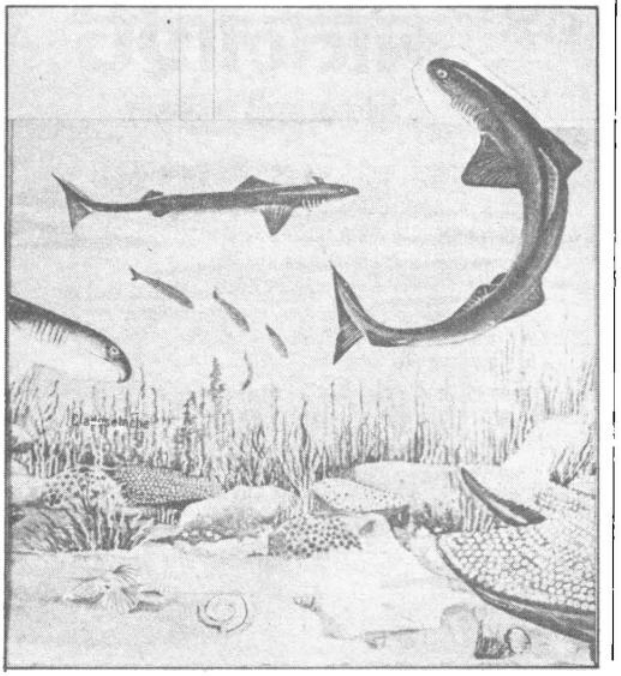

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—দাম খুবই কম।

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568/R/BEN

অর্থ জানো

ঋষভ…অঙ্গুষ্ঠ…

কত শব্দ মনে আসে, কিন্তু আমরা তা অনেক সময়ে ব্যবহার করতে ইতস্তত করি। তার কারণ হল, সেই সব শব্দের অর্থ আমাদের কাছে অস্পষ্ট। কিন্তু তা কেন হবে, যদি আমরা শব্দের অর্থ জানি ?-শব্দের ব্যবহারে আমরা সাহসী কেন হব না ? নীচের প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **মামুলি**—(ক) খেলো, (খ) শস্তা, (গ) চিরপ্রচলিত, (ঘ) সাবেকি।

২। **ঋষভ**—(ক) ঋষিতুল্য, (খ) বৃষ, (গ) গর্দভ, (ঘ) গাভী।

৩। **উটকো**—(ক) আজেবাজে, (খ) অপ্রত্যাশিত, (গ) অপ্রয়োজনীয়, (ঘ) অপরিচিত।

৪। **অঙ্গুষ্ঠ**—(ক) শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, (খ) কড়ে আঙুল, (গ) বুড়ো আঙুল, (ঘ) অঙ্গের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ।

৫। **টোলা**—(ক) বড় পাঠশালা, (খ) পাড়া, (গ) বাজার, (ঘ) ঘরবাড়ি।

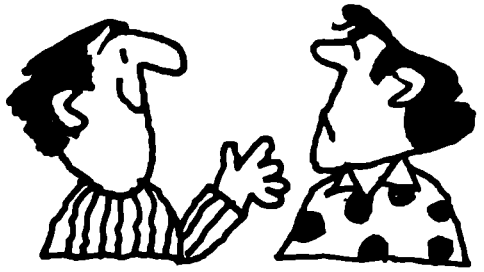

উত্তর : ১। **মামুলি**—(গ) চিরপ্রচলিত। যেমন, 'ঘটকালি করতে হলে ইনিয়ে-বিনিয়ে বানিয়ে নানা কথাই বলা হচ্ছে মামুলি দস্তুর' (প্রমথ চৌধুরী)। 'মামুলি' আরবি শব্দ। বাংলায় এর অন্য অর্থ সাধারণ। যেমন, মামুলি কাজ।

২। **ঋষভ**—(খ) বৃষ। বাংলায় শ্রেষ্ঠ অর্থেই বেশি ব্যবহার। যেমন, 'অভিমানে মহামানী বীরকুলার্ষভ রাবণ কহিলা' (মধুসূদন দত্ত)।

৩। **উটকো**—(ঘ) অপরিচিত। হঠাৎ আগত ও অপরিচিত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মূলে রয়েছে হিন্দি শব্দ উটক্কর, যার অর্থ 'অজানা'। যেমন, 'এখন একটা উটকো মিনসে এসে কর্তামি করবে তা আমি সইব না' (পরশুরাম)।

৪। **অঙ্গুষ্ঠ**—(গ) বুড়ো আঙুল। এই সংস্কৃত শব্দটি বাংলায় সাধারণ আঙুল অর্থে প্রচলিত, যার ফলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ জীবাত্মা বা হৃদয়। অর্থ হল অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ।

৫। **টোলা**—(খ) পাড়া। যেমন, কলুটোলা আহিরিটোলা।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

চামেলির প্রশ্ন

চামেলি বড়-একটা চুপচাপ থাকে না প্রায় সবসময়েই কথা বলে। সেদিন সে হঠাৎ বাবাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল।

"Daddy," she asked, "do you know whose signature we have on our money?"

"Money?" said Daddy. "Do you mean our currency notes?"

"Yes. Do you know whose signature they bear?"

"I should think I do. That of the Governor of the Reserve Bank of India. Why, didn't you know that?"

Chameli said, "I didn't, till our history teacher showed us in the class the signature on a five-rupee note. Nobody of our class knew. Isn't it funny?"

Daddy said, "There are many things you've yet to learn. I'll tell you . Who signs a one rupee note?"

"Why, the same man, I suppose?"

"Ah, I knew you'd say that. No, not the Reserve Bank Governor. It's the Secretary, Finance Ministry, Government of India. Do you know why? It's because the one-rupee notes are not currency notes at all, but just coins, paper coins."

A friend of Chameli's presented to her on her last brithday the two-volume 'General Knowledge of Growing Children'. Since then she has got into the habit of asking questions. She has also grown very fond of quiz competitions.

কিছুদিন আগে সেইরকম এক প্রতিযোগিতায় চামেলিদের স্কুল যোগ দিয়েছিল।

Chameli's school sent a four-member team of senior girls to the competition. It was a day-long programme with a thirty-minute break for refreshments. Chameli sat through it. She also felt she could have answered many of the questions, but not the one on India's Five-Year Plans.

দ্যাখো, এই রকম ক্ষেত্রেও বিশেষ্যপদ বিশেষণ হিসেবে কাজ করছে। বিশেষ করে লক্ষ করো, সেই বিশেষ্যপদটি কখনওই বহুবচনের হয় না :

Five-rupee note; two-volume *General Knowledge for Children*; four-member team; Five-year plan

প্রসাদ

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী !
Milk Bikis
BRITANNIA
Milk Bikis
সুস্বাদু পুষ্টিকর বিস্কুট
ব্রিটানিয়া
LINTAS BIN MB 9 2720 BG

বাবুই ও তার আশ্চর্য বাসা

শান্তনু ঘোষ

জীবই হোক আর জড়ই হোক, পৃথিবীতে কেউ বাঁচে তার নিজের রূপে, কেউ তার কাজে। সারা দুনিয়ায় পাখি আছে অনেক, কিন্তু বাবুইয়ের কৌলীন্য আলাদা। অথচ বাবুই জাতেই উঠত না, যদি অমন বাসা সে না বানাত!

বর্ষা বা গরমের সময় গ্রামে একটি আবাদি অঞ্চলে গেলে একটা দৃশ্য অনেক সময়ই চোখকে টানে। তা হল গাছে ঝুলে থাকা উলটো কুঁজোর সারি। বাবুইয়ের বাসা। কাছে গিয়ে দেখলে বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠবে। কী করে এইটুকু একটা পাখির পক্ষে এমন বাসা বানানো সম্ভব!

বাবুইকে একা প্রায় দেখাই যায় না। এরা বাস করে ঝাঁকে। সবাই এক সঙ্গে থাকার ইচ্ছে এদের এতই প্রবল যে, অনেক সময় এরা বাসায় ডিম বা সদ্যোজাত বাচ্চা ফেলে রেখেই চলে যায়। দল বেঁধে হানা দেয় ফসলের খেতে। শস্যের ক্ষতি হয় এতে যথেষ্ট। তবে কিছু পোকামাকড়ও এরা খেয়ে সাফ করে দেয়। গরমকালে এদের থাকার জায়গা আখের খেত বা নলখাগড়ার জঙ্গল।

বাবুই আবাসিক পাখি। একশো থেকে একশো পঞ্চাশটা পাখির এক-একটা ঝাঁক বাসা বানানো ও ডিম পাড়া ছাড়া অন্য সময় ঘুরে বেড়ায় এক খেত থেকে অন্য খেতে। ঘুমোবার জায়গায় সব দল এসে মেলে এক জায়গায়। সেখানে শুধু বাবুই আর বাবুই। এদের খাবার প্রধানত ধান, গম, জোয়ার, ভুট্টা, ঘাসের বীজ, ও পোকামাকড়।

বাবুই দেখতে অনেকটা চড়ুইয়ের মতো। লম্বায় ইঞ্চি ছয়েক। স্ত্রী-পুরুষের চেহারায় খুবই মিল। মেয়েদের মাথা থেকে পিঠের রঙ হালকা হলুদ, তাতে বাদামি ডোরা। সাদা রঙের গলায় হলুদ ফুটকি। বুকের হালকা হলুদ রঙ আরও ফিকে হয়ে এসেছে পেট-বরাবর। দুধার থেকে নেমেছে বাদামি ডোরা। পুরুষ-বাবুইয়ের চেহারা অবিকল স্ত্রী-বাবুইয়ের মতো। তফাত শুধু পুরুষদের পিঠ ও মাথার ডোরাগুলো আরও গাঢ় রঙের। স্ত্রী-পুরুষের ফারাকটা বেশি ধরা পড়ে বাসা বোনা ও ডিম দেওয়ার সময়। তখন পুরুষের দল প্রকৃতির সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসে বিয়ের রঙিন পোশাক পরে। মাথা ও বুকের পালকগুলো হয়ে ওঠে উজ্জ্বল হলুদ। গলা ও কানের ওপর ছাড়া অন্য অংশ ঘন বাদামি। তার ওপর হলদে ও কালোর ডোরা। পেট থেকে শুরু করে বাকি অংশের রঙ খড়-ধোওয়া জলের মতো। ঠোঁটটা ছোট, ভারী ও তিনকোনা। তাতে হলুদ ও বাদামির মিশেল। পা ধূসর-বাদামি রঙের।

বাসা তৈরির সময় স্থান নির্বাচন বাবুই কীভাবে করে তা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও খুব পরিষ্কার নয়। তবে বাসা ঝোলাবার উপযুক্ত গাছ, কাছে-পিঠে জল ও দানাশস্য—যেমন ধান, জোয়ার ইত্যাদির খেত, এগুলো থাকতে হবে। দানাশস্যের পাতা প্রথম দরকার হবে বাসা তৈরির কাজে, পরে ফসল পাকলে পেট ভরাবার জন্যে। বাসা তৈরির পক্ষে পছন্দসই গাছ তাল, নারকেল, আম, খেজুর, বাবলা ও শিশু। অন্য গাছ, এমনকী টেলিগ্রাফের তারেও কখনও-কখনও বাবুই বাসা ঝুলিয়ে দেয়। ওইটুকু পাখি কিন্তু বুদ্ধি দেখলে অবাক হতে হয়। সে জানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর খবর। জানে তার গতিবেগ, তার গতিপথ। বাসা বানায় বাতাসের গতিপথের উলটো দিকে, যাতে ঝড়-বাদলে বাসা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা ডিম না পড়ে যায়। এক-একটা গাছে বাসার সংখ্যা চার-পাঁচটা থেকে দুশো–আড়াইশো পর্যন্ত।

বাসা তৈরি পুরুষ-বাবুইয়ের কাজ, মেয়ে-বাবুই ধারেই ঘেঁষে না। তার কাজ পুরুষ নির্বাচন, ডিম পেড়ে বাচ্চা তোলা, তাদের বড় করা ও একটু-আধটু ঘরদোর সাফ করা। বাসা

উপরের ছবি পুরুষ-বাবুইয়ের, নীচেরটি মেয়ে-বাবুইয়ের

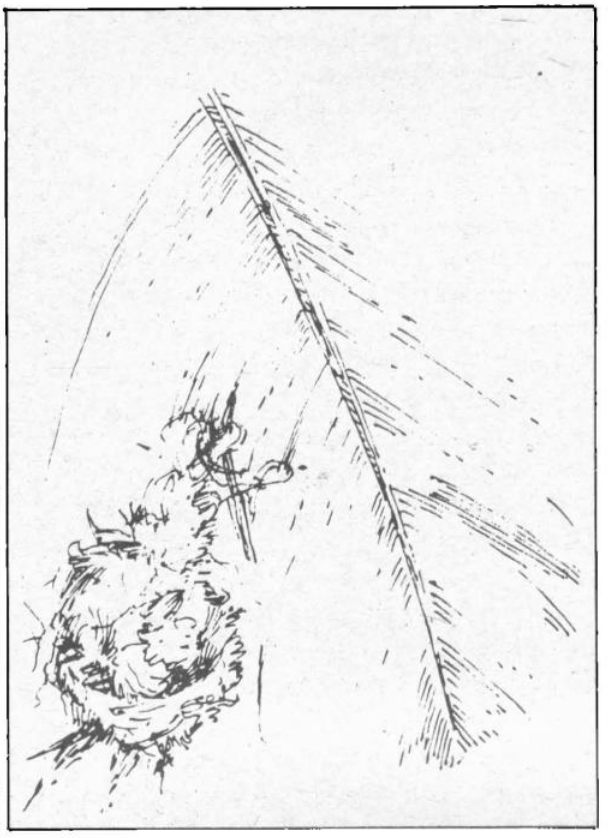

বাবুই প্রথমে গাছ বেছে নেয়, তারপর তার পছন্দসই ডাল থেকে ঝুলিয়ে দেয় পাতার সুতো

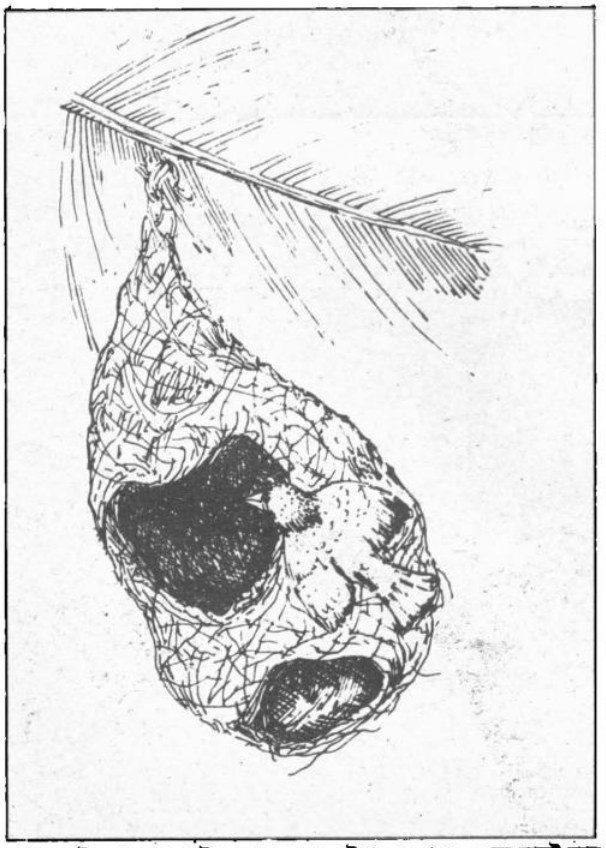

বাসার বাইরে পুরুষ-বাবুই। তার আশা, এইবারে কোনও মেয়ে-বাবুই তার ঘরনী হতে আসবে

তৈরির শুরুতে প্রথম কাজ মাল-মশলার জোগাড়। এ-কাজ করে পুরুষ-বাবুই একাই। রসদ সংগ্রহে নেমে প্রথমে এরা পছন্দসই একটা গাছ ঠিক করে। তবে এ-কাজে বাবুইয়ের বেশি পছন্দ ধান বা জোয়ারের কাঁচা পাতা। কারণ, কাঁচা পাতায় নমনীয়তা অনেক বেশি থাকে, যেদিকে ইচ্ছে বাঁকানো যায়। বাবুই যখন বাসা বোনে, তখন তারা পাতা চিরে একসঙ্গে সংগ্রহ করে অনেকগুলো করে পাতার ফালি। বাসা তৈরির প্রথম দিকে এগুলো তারা ধরে থাকে পা দিয়ে, পরে কিছুটা তৈরি হয়ে গেলে ঝুলিয়ে রাখে বাসার মধ্যে। ধান, জোয়ার, আখ বা ঘাসজাতীয় গাছের পাতার ধারে থাকে করাতের মতো দাঁত। ফলে বাসায় পাতার খানিকটা অংশ গুঁজে দিলে দাঁতে লেগেই তা ঝুলতে থাকে। ধরে থাকতে হয় না।

পাতার চিলতে বেশ কিছু জোগাড় হয়ে গেলে বাবুই বসে বাসা বুনতে। এ-কাজে গোড়াতেই তারা ঠিক করে নেয় গাছের পছন্দসই একটা ডাল, যা থেকে ঝুলবে তাদের বাসা। এর পর চলে বোনার কাজ। পছন্দ-করা ডালটাতে ফিতের মতো করে বুনে পাতার সুতো এবার ঝুলিয়ে দেয় ডাল থেকে। বাসা তৈরির এ-পর্যায়টা এরা খুব সাবধানে আর ধরে ধরে করে। কারণ এই সুতোগুলোর ওপরই ঝুলে থাকে পুরো বাসাটা। ওপর থেকে ঝোলানো ও পেঁচিয়ে ফিতের মতো করা আঁশগুলো দিয়ে এবার এরা তৈরি করে একটা ফাঁস, বাসার কাঠামো। এ-সময়ে বাসাকে দেখতে লাগে একটা গোল চাকার মতো। ফাঁসের নীচের দিকটা ক্রমাগত আঁশ জড়িয়ে মোটা করা হয়, এখানে বসেই পুরো বাসাটাকে বাবুই রূপ দেয়। ফাঁসের মাথা থেকে সামনে-পেছনে দু'দিকেই বার করা হয় গাড়ি-বারান্দা। একটা দিক চওড়া ও গোল করে বুনে এবার তৈরি হয় ডিম রাখার কুঠুরি। অন্য দিক তত ফোলা নয় বরং বেশ কিছুটা লম্বা ও সরু করে নামিয়ে আনা হয়—অনেকটা কুঁজোর গলার মতো করে। একে বলা যেতে পারে প্রবেশ-নালী।

ফাঁসের দু'দিক থেকে গাড়ি-বারান্দা যখন নামছে, সে-সময় দু-চারটে কাদার ঢেলা এরা এনে রেখে দেয় ওই ফাঁসের ওপর। কেন যে এটা করে তা বিজ্ঞানীরা আজও বুঝতে পারেননি। ওপর থেকে বুনতে বুনতে এবার ফাঁসের তলা ছাড়িয়ে চলে যায় আরও নীচে। তারপর দেওয়ালটাকে গোল করে মুড়ে আস্তে তুলে আনে ওপরে। মিলিয়ে দেয় ফাঁসের তলার সঙ্গে, তৈরি হয়ে যায় ডিম-কুঠুরি। এখানেই থাকবে মা, প্রথমে ডিম ও পরে তার বাচ্চাদের নিয়ে। দেওয়ালকে ফাঁস ছাড়িয়ে আরও নীচে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য একটাই—ডিম-কুঠুরিকে গভীর করা। যাতে ডিম বা বাচ্চা বাইরে না পড়ে যায়। পুরো বাসাটাকে এ-অবস্থায় দেখায় একটা গম্বুজের মতো। খেটে মরছে গোড়া থেকে পুরুষ-পাখিরা, মেয়েদের পাত্তাই নেই। গম্বুজ অবস্থা শেষ হয়েছে কি হয়নি, অমনি আসতে শুরু করল মেয়ের দল। পুরুষদের তখন সে কী আনন্দ! এদিক-ওদিক উড়ে গান গেয়ে একাকার কাণ্ড। মেয়ে-বাবুই কিন্তু পাকা জহুরি। পুরুষ নির্বাচন করে বেশ দেখেশুনে। বাবুই-সমাজে জোড় বাঁধার ব্যাপারে পছন্দ করবার পুরো অধিকারটাই মেয়েদের। ছেলের দল লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গাছের ওপর, স্ত্রী-লাভের পরীক্ষা দিতে। এই কারণেই পুরুষ-বাবুই তৈরি করে রাখে

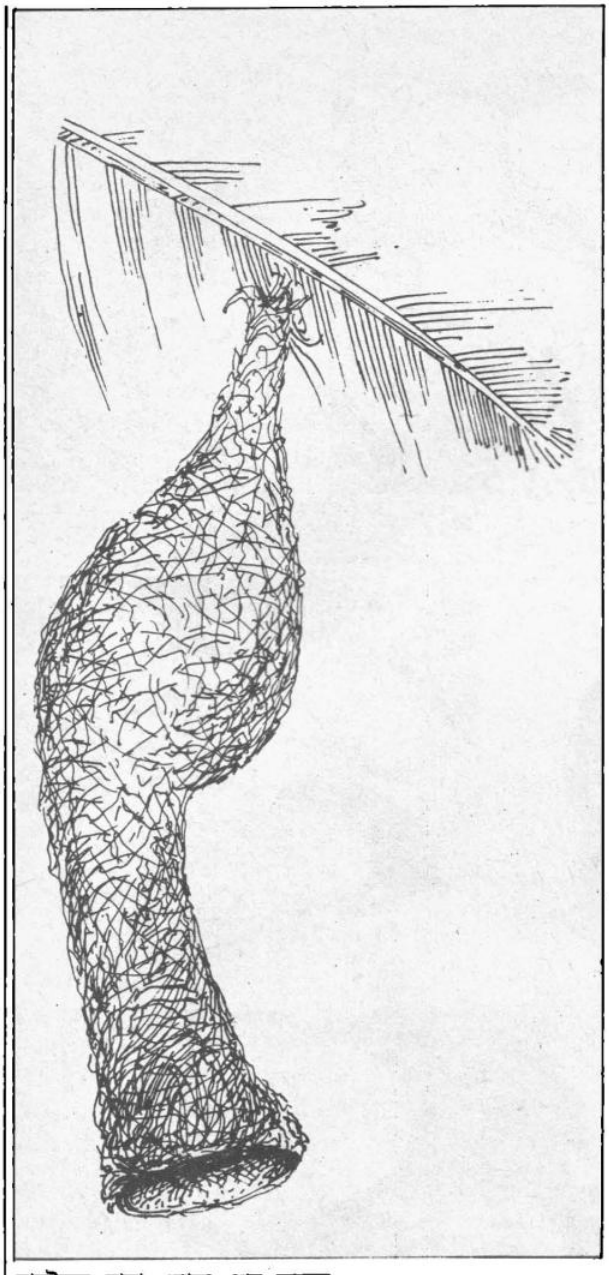

বাবুইয়ের বাসা এবারে শেষ হয়েছে

একাধিক বাসা। যাতে একটা অন্তত পছন্দ হয়। তবে কোনওটাই এরা শেষ করে না। পরীক্ষক মেয়ের দল এসেই বাসা পরীক্ষায় লেগে যায়। এটা নেড়ে ওটা টেনে একেবারে খুঁটিয়ে দেখে নেয় বাসার অবস্থা। পছন্দ হলে তবেই ঘর বাঁধা। আবার কখনও এমন হয়, একটা বাসাই পছন্দ হয়ে গেল দুই মেয়ে-বাবুইয়ের। ব্যস, লড়াই। বাসা যে জিতবে তার।

ডিম-কুঠুরি তৈরি হয়ে থাকলে ভাল, নয়তো সেটাকেই আগে শেষ করবে পুরুষ-বাবুই। তারপর বসবে প্রবেশ-নালী তৈরির কাজে। এদিককার দেওয়াল কিছুটা সে আগেই তৈরি করে রেখেছিল। এখন ঝটপট বাড়িয়ে লম্বা করে যাবে। ওদিকে ফাঁসের তলা থেকে বোনা হবে আর একটা দেওয়াল। দুটোকে এবার গোল করে জুড়ে দিলেই কুঁজোর গলার মতো প্রবেশ-নালী। শত্রু, বিশেষ করে সাপ ও গেছো ইঁদুরের হাত থেকে মা ও তার বাচ্চাদের বাঁচাতে পুরুষ-বাবুই বাসার প্রবেশ-নালীকে ইচ্ছে করেই অনেকটা বড় (এক-দেড় ফুট) করে রাখে। এদিকে বাসায় ঢোকার প্রবেশ-পথ নীচের দিকে, বাবুইকে ঢুকতেও হয় সে-পথে। উড়তে উড়তে প্রবেশ-নালীর ঠিক নীচে এসে পাখা গুটিয়ে সটান এরা উঠে যায় ওপর দিকে। বাসায় ঢোকার এই কৌশলটা এরা রপ্ত করেছে এত নিপুণভাবে যে, অত বড় খাড়া একটা নালীর ভেতর দিয়ে ঢুকে যায় কিন্তু ধাক্কা কোথাও লাগে না। প্রবেশ-নালী তৈরি শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয় বাসা তৈরির কাজ। স্ত্রী-বাবুই এরই মধ্যে ঢুকে যায় কুঠুরিতে। এখন সে ডিম পাড়বে। বাসা যথেষ্ট বড় হলেও শুকনো অবস্থায় ওজন, গড়ে মাত্র ষাট-সত্তর গ্রাম।

স্ত্রী-বাবুই বেজায় কুঁড়ে। নড়েই বসে না। বাসা তৈরির মতো একটা কর্মকাণ্ডে তার কাজ শুধু একটু-আধটু অন্দরমহল সাফ করা, কখনও একটা পালক বা তরকারির একটু খোসা এনে ডিম-কুঠুরির মেঝেকে নরম করা। যাতে তা দিতে বসলে কোনও অসুবিধে না হয়।

ভেতরের ব্যবস্থা পাকা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্ত্রী-বাবুই ডিম দেয়। সংখ্যায় দুই থেকে চার, ধব্‌ধবে সাদা। একটু লম্বাটে। সাইজে একটা কাঁচের গুলির মতো।

অন্ধকার তাড়াতে বাবুই বাসায় জোনাকি রাখে। এমন একটা কথা চলে আসছে আজ বহুদিন ধরে। পেছনে যুক্তি যদিও এর কিছুই নেই। কারণ, জোনাকি মরে গেলে সে আর কিছুতেই আলো ছড়ায় না।

ডিমে তা মেয়ে-বাবুই একাই দেয়। দিনের বেলা এদিক-ওদিক উড়ে গেলেও সূর্য ডোবার পর থেকে পরদিন সূর্য ওঠা পর্যন্ত সে ডিমে বসে থাকে একটানা। বাচ্চা ফুটতে সময় লাগে ১৪-১৮ দিন। বাচ্চাকে খাওয়াবার দায়িত্ব প্রধানত মা'র। শুঁয়োপোকা, কেঁচো বা অন্য নরম পোকা এরা ধরে আনে আশপাশ থেকে। তুলে দেয় বাচ্চাদের মুখে। সন্তান-পালনে মায়েদের খাটুনি যথেষ্ট। বাচ্চাদের তখন রাক্ষুসে খিদে। পোকামাকড় আর মায়ের ওগ্‌রানো খাবার মিলে এক-একদিনে বাচ্চা খায় তার নিজের ওজনের প্রায় তিনগুণ। সদ্য ডিম থেকে ফোটা বাচ্চার গায়ে পালক-টালক কিছুই থাকে না। দেখতে লাগে একতাল কাঁচা মাংসের মতো। বড়ই অসহায়। চোখেও দ্যাখে না। নির্ভর করে শুধু মা'র ওপর। ভালমন্দ খেয়ে ক'দিনেই চোখের দৃষ্টি ফোটে। পালক গজায়। পনরো থেকে সতেরো দিনের মধ্যেই বাচ্চারা উড়তে শেখে। বাপ-মা'র দায়িত্বও শেষ হয়।

শুধু বাসা বানাবার দক্ষতাই নয়, ঠিকমতো শিক্ষা দিলে বাবুই বেশ কিছু কঠিন খেলা—যেমন, কুয়োর ভেতর ছুঁড়ে দেওয়া চাক্‌তিকে জল ছোঁবার আগেই তুলে আনা বা ছুঁচে সুতো পরানো অথবা ছড়িয়ে রাখা অনেক তাসের ভেতর থেকে একটা বিশেষ তাসকে ঠিক-ঠিক চিনে বার করা ইত্যাদি সব এত নির্ভুলভাবে আর অবলীলায় করে যে, বুদ্ধির দৌড়েও তাকে বেশ সামনের সারির বলেই মনে হয়।

ফোটো : কাঞ্চন দে। ছবি : সীতারাম মণ্ডল

এক

সুপার ফাইটার

কি ক'রে দাঁতের গর্তের সঙ্গে যুদ্ধ করল।

একদিন আমার ছেলে হাঁফাতে হাঁফোতে এসে বলল...

"মা, মা, অনিলের দাঁতে পোকায় বাসা করেছে"

"মানে, দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে গর্ত হয়েছে, সোনা"

দাঁতে গর্ত ?

তাকে বোঝালাম, কি ক'রে দাঁতকে একনাগাড়ে কত হামলা সইতে হয়...

"দাঁতে গর্ত হওয়ার কারণ হল, দাঁতের ফাঁকের খাবারের কণায় জীবাণু জমে একরকম অ্যাসিড তৈরী করে, যা দাঁতের এনামেলের ওপর হামলা করে"

...আর, ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড কি ভাবে কাজ ক'রে ওর দাঁতে সুরক্ষিত রাখে...

"ফরহ্যান্স ফ্লোরাইডের ফ্লোরাইড দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে সত্যি-সত্যিই দাঁত শক্ত করে..."

..."ফলে, জীবাণু দাঁত ভেদ ক'রে গর্ত করতে পারে না"

"হুঁ হুঁ, আমার স্বাদওয়ালা, ফেনাওয়ালা সুপার ফাইটার"

আর, তার ওপর,
ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড দেয়
ফরহ্যান্স-এর সেই সুবিখ্যাত যত্ন !

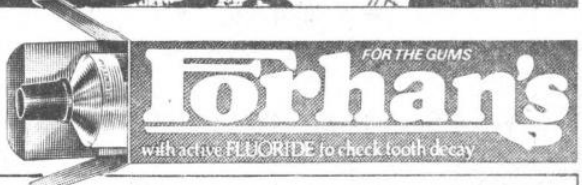

ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড মাড়ি সঙ্কুচিত করে, ক্ষয়ের মোকাবিলা করে।

404-GM-244 BEN

বাঘটা মন্দিরের ভেতর প্রণাম করতে ঢুকেছে···

ডনের বাঘ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শ্রীমান ডন ঘরে ঢুকে বলল, "মামা, দুটো টাকা দেবে ?"

খুব মন দিয়ে একটা রহস্য-কাহিনী লিখছিলুম। তাই ঝামেলা না বাড়িয়ে বললুম, "আচ্ছা দেব'খন।"

ডন এগিয়ে এসে লেখার কাগজে হাত রাখল। এখন জোর করে ওর হাতটা যদি সরানোর চেষ্টা করি, তা হলে কী ঘটবে, তা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে। অভিজ্ঞতাও কম নেই। এই যে চেষ্টা করে অনেক ভেবে-চিন্তে একটা পাতা প্রায় শেষ করে এনেছি, পুরোটাই গচ্চা যাবে। কাজেই ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে ওর মুখের দিকে তাকালুম।

ডন মিটিমিটি করে হাসছিল। এ-হাসির মানে আমি ভালই জানি। বেড়াল যখন কোনও হতভাগা ইঁদুরকে থাবার তলায় পেয়ে যায়, তখন তার মুখে ঠিক এই হাসিটি ফুটে ওঠে।

ডন বলল, "তুমি বুঝি ভাবছ আমি ঘুড়ি কেনার জন্যে টাকা চাইছি ? ঘুড়ির দাম তো অত না।"

"তা হলে ?"

ডন এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি একটা বাঘ কিনব।"

এসব সময়ে ডনের সামনে হাসবার ঝুঁকি অনেক। তাই আমিও গম্ভীর হয়ে বললুম, "সত্যিকার বাঘ, না খেলনা বাঘ ?"

"সত্যিকার বাঘ।" বলে ডন সেটার সাইজও দেখিয়ে দিল দু হাত দিয়ে।

"বাঘটা কি জ্যান্ত ?"

"হুঁউ।" ডন আবার আমার কনুইয়ের কাছে চিমটি কাটল। ওর চিমটি খাওয়ার অভ্যেস আমার আছে। তবে এটা নিতান্তই ফার্স্ট ওয়ার্নিং।

অতএব ড্রয়ার থেকে ওকে দুটো টাকা বের করে দিলুম। ডন আড়চোখে ড্রয়ারের ভেতরটা দেখে নিয়ে ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, "বাঘ কী খায়, মামা ?"

"পাঁঠার মাংস।"

"মাংসের টাকাটা পরে নেব মামা। আগে বাঘটাকে নিয়ে আসি।" বলে ডন প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লেখার তাল কেটে গেলে এই এক সমস্যা। তার ওপর রহস্য-কাহিনী বলে কথা ! যতবার কাগজের পাতায় রহস্য

আনার চেষ্টা করি, ততবার ডনের বাঘ এসে হালুম করে ডেকে ওঠে। ডনের এই বাঘটার রহস্য আমার কাল্পনিক রহস্যটাকে বোকা বানায়। অগত্যা কাগজ-কলম রেখে হাই তুলে ভাবতে বসলুম এবং ভাবতে বসেই ভীষণ চমকে উঠলুম। ডন কি সত্যিই বাঘ কেনার জন্য দুটো টাকা নিয়ে গেল ? দু'টাকায় বাঘ ! সত্যিকার এবং জলজ্যান্ত বাঘ ? ডনের বিচ্ছুপনার শেষ নেই। কিন্তু পারতপক্ষে আমার কাছে তো সে মিথ্যে কথা বলে না। অন্তত বলার কোনও প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাইনি। অনেক ক্ষেত্রে তার বোঝবার ভুল হয়েছে বলে তার অনেক কথা মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু সে তো তার দোষ নয়। যেমন, আজব চাকতি খেয়ে রামু ধোপার গাধাটার ভালুক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ! চাকতিটা যে লোকটা ডনকে বেচেছিল, মিথ্যেবাদী তো সেই লোকটাই। চাকতি খেয়ে গাধা ভালুক কিংবা ভালুক গাধা হয় না, সে কি ডন জানত ?

ডনের দু'টাকায় বাঘ কেনা নিয়ে যত ভাবলুম, তত অস্বস্তি হল। এ-বাজারে দু'টাকায় বাঘ কেনা যায়, তার চেয়ে আশ্চর্য, বাঘের যে বড্ড আকাল পড়ে গেছে। ঘণ্টাখানেক ধরে ধুপ ধুপ শব্দে টের পেলুম শ্রীমান আসছে। দরজায় উঁকি মেরে তাকে দেখতে পেয়ে বললুম, "কই রে ? তোর বাঘ কোথায় ?"

ডন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "আমার সঙ্গে এসো তো মামা ! শিগ্‌গির এসো।"

"কোথায় যাব তোর সঙ্গে ?"

"আ, এসো না ! বাঘটাকে নিয়ে আসবে।"

ডন আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। মুখ খুলতেই দিল না। খেলার মাঠ পেরিয়ে ঝিল। ঝিলের ওধারে জঙ্গলের ভেতর ভাঙা শিবমন্দির। সেখানে গিয়ে সে চাপা স্বরে বলল, "বাঘটা মন্দিরের ভেতর আছে। আমার ভয় করছে বড্ড। তুমি ওকে নিয়ে এসো মামা।"

একটু অবাক হয়ে বললুম, "তুই দেখেছিস, মন্দিরের ভেতর বাঘ আছে ?"

"হুঁউ। চলো, তুমিও দেখবে।"

বুকটা ধড়াস করে উঠল। মন্দিরের ভেতর যদি সত্যি-সত্যিই একটা বাঘ থাকে, তা হলে তো বড্ড ভয়ের কথা। আমাকে দেখে যদি হালুম করে ওঠে, নির্ঘাত ভিরমি খেয়ে পড়ব, আর বাঘটা এসে আমার মাংস ছিঁড়ে খাবে। ভাবতেই শরীর ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল। বললুম, "ডন, তুই কী বলছিস ? এই ভাঙা মন্দিরে বাঘ আসবে কোত্থেকে ? আজকাল কি আর যেখানে-সেখানে বাঘ আছে নাকি ? সব বাঘ তো এখন টাইগার-প্রজেক্টে গিয়ে ঢুকেছে !"

ডন রাগ করে বলল, "ভ্যাট ! তুমি বড্ড ভিতু, মামা ! আগে গিয়ে দেখবে তো।"

পা টিপে-টিপে বটগাছের ঝুরির আড়ালে এগিয়ে গেলুম। ডন আমার পেছনে। এবার ফিসফিস করে বলল, "ওই দ্যাখো, লেজ নড়ছে। কী ? দেখতে পাচ্ছ তো ?"

সত্যি ওটা একটা লেজই বটে। কিন্তু কিসের লেজ, তা আরও ভাল করে দেখার জন্য প্রচণ্ড সাহসে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। তারপরই দেখতে পেলুম বাঘটাকে। বুকের রক্ত ছলাত করে উঠল। হাত-পা একেবারে অবশ হয়ে গেল যেন। হুঁ, সত্যিকারের বাঘ ! একেবারে জলজ্যান্ত ডোরাকাটা কেঁদো বাঘ ! দুই থাবার মাঝখানে মাথাটা রেখে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। লেজটা মাঝে-মাঝে নড়ছে, কিংবা পেছনের থাবা দিয়ে লেজ চুলকোচ্ছে।

ডন আমাকে আঙুলের ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে দিল। ফিসফিস করে বলল, "দেখলে তো ?"

ওকে চোখ টিপে ইশারা করে অনেকটা তফাতে নিরাপদ জায়গায় সরে এলুম। তারপর দম আটকে-যাওয়া গলায় বললুম, "আশ্চর্য ডন ! খুবই আশ্চর্য ! এ যেন স্বপ্ন দেখছি রে ডন !"

ডন মুচকি হেসে বলল, "দু'টাকায় কিনেছি মামা।"

"কিন্তু কিনলি কার কাছে ?"

"একটা লোকের কাছে।"

"কোথায় সে ?"

ডন এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। এখানেই বসে ছিল লোকটা। আমি ওই গাছে ঘুড়ি পাড়তে উঠেছিলুম। ঘুড়িটা উঁচুতে আটকে আছে। পাড়তে পারলুম না। গাছ থেকে নেমে দেখি লোকটা বসে আছে।"

"বুঝলুম। তারপর ?"

"লোকটা বলল, খোকাবাবু, বাঘ কিনবে ? দু'টাকা দাম।"

"তখন বাঘটা কোথায় ছিল ?"

"ওর পাশেই শুয়ে ছিল।"

"তোর ভয় করল না ?"

"করছিল তো। লোকটা বলল, খুব ভাল বাঘ। কামড়ায় না। পোষা বাঘ কিনা !"

"তারপর ?"

ডন আনমনা হয়ে বলল, "তারপর তো তোমার কাছে টাকা চেয়ে এনে ওকে দিলুম। ও বলল, বাঘটা মন্দিরের ভেতর প্রণাম করতে ঢুকেছে। প্রণাম করা হলে বাড়ি নিয়ে যেও।"

"তারপর সে চলে গেল তো ?"

"হ্যাঁ। যাবার সময় মন্দিরের সামনে গিয়ে বাঘটাকে বলে গেল, বুদ্ধুরাম ! এই খোকাবাবুর সঙ্গে যাস। ওর কথা শুনিস।" ডন দম নিয়ে ফের বলল, "বাঘটার নাম বুদ্ধুরাম, মামা !"

"হুঁ। তারপর তুই বাঘটাকে আনতে গেলি বুঝি ?"

"গেলুম। কিন্তু বড্ড ভয় করল। তখন তোমাকে ডাকতে গেলুম।"

একটু ভেবে বললুম, "বাঘটার নাম বুদ্ধুরাম, তা হলে আয় তো, এবার ওকে নাম ধরে ডেকে দেখি !"

দু'জনে আবার খুব সাহস করে ঝুরির আড়ালে এগিয়ে গেলুম মন্দিরের কাছে। তারপর সাহস করে এবং খুব স্নেহ-ভালবাসা মাখিয়ে ডাকলুম, "বুদ্ধুরাম ! ও বুদ্ধুরাম !"

কিন্তু আমাদের দু'জনকেই ভীষণ হকচকিয়ে দিয়ে বাঘটা একেবারে মানুষের গলায় যেন বলে উঠল, "কে ? গঙ্গু এলি নাকি ! উঃ ! খিদেয় নাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে রে।"

তারপরই সে মুখ তুলে আমাদের দেখতে পেল। দেখতে পেয়ে তড়াক করে উঠে বসল।

আসলে শরৎকালের ঝকমকে রোদ্দুরে এই জঙ্গলের ভেতর ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় চকরা-বকরা ছায়া জমে আছে। আর ভাঙাচোরা মন্দিরের ভেতরটা দিনদুপুরেই আঁধার হয়ে আছে। চোখের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। "তবে রে

ব্যাটাচ্ছেলে !" বলে হুঙ্কার ছেড়ে এগিয়ে গেলুম। "একটা বাচ্চা ছেলেকে পেয়ে ঠকানোর মজা দেখাচ্ছি এবার !" অমনি বুদ্ধুরাম মন্দিরের ভেতর থেকে বাঘের মতো চার ঠ্যাঙে (দরজাটা ছোট্ট) বেরিয়ে এক লাফ দিল। মতলব টের পেয়ে আমিও একখানা লাফ দিলুম। তবে বুদ্ধুরামের লেজের ডগাটাই শুধু ধরতে পারলুম এবং সেই শুকনো ডোরাকাটা জিনিসটা আমার মুঠোয় রয়ে গেল। বুদ্ধুরাম দুই ঠ্যাঙে নড়বড় করে দৌড়ে জঙ্গলের ভেতর উধাও হয়ে গেল।

ঘুরে দেখি, শ্রীমান মনমরা হয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ওর কাছে গিয়ে বললুম, "যাক্‌গে, যা হবার হয়ে গেছে। দুঃখু করিসনে। দু'টাকায় অন্তত বাঘের লেজ কিনতে পেরেছিস, এই যথেষ্ট। এই নে।"

ডন লাল-হলুদ রঙের ডোরাকাটা ন্যাকড়া জড়ানো খড়ের লেজটা হাতে নিল বটে, কিন্তু তক্ষুনি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুখটা বাঁকা। দৃষ্টি নীচের দিকে।

কাঁধে হাত রেখে বললুম, "দোষটা আমারই, জানিস ? গতকাল ওই বুদ্ধুরাম গায়ে রঙ মেখে বাঘ সেজে খেলা দেখাচ্ছিল বাজারে। ওর সঙ্গী গঙ্গারাম ঢোল বাজিয়ে গান গাইছিল আর বুদ্ধুরাম বাঘের নাচ দেখাচ্ছিল। রাতারাতি ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলুম। আজকাল আর আমার কিচ্ছু মনে থাকে না রে !"

ডন ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে গলার ভেতর বলল, "তা হলে ঘুড়িটা পেড়ে দেবে এসো।"

যাবার সময় বাঘের লেজটা কী ভেবে কুড়িয়ে নিল। খুশি হয়ে বললুম, "ওটা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা যাবে। দু'টাকা দিয়ে কেনা একটা দারুণ স্যুভনির ! কী বলিস ?"

ডন জবাব দিল না। এখন ওর চোখ সেই গাছটার দিকে, যার ডগায় ওর রঙিন ঘুড়িটা আটকে আছে। শরৎকালের ঝলমলে নীল আকাশের গায়ে মাথা কোটার ভঙ্গিতে ঘুড়িটা দুলে-দুলে উঠছে। ঘুড়িটার জন্য ডনের মতোই মায়া লাগছিল।

ছবি : প্রবীর সেন

জেনে নাও

তারা মিটমিট করে, গ্রহ কেন করে না ?

কবিতায় কে না পড়েছে ছোটবেলায়,'টুইংকল্, টুইংকল্, লিট্‌ল স্টার !' আকাশে গ্রহও আছে, তারাও আছে। কিন্তু শুধু তারারা কেন মিটমিট করে ?

পৃথিবী থেকে গ্রহেরা যত দূরে আছে, তারারা আছে তার চেয়েও অনেক দূরে। ফলে একটা তারা থেকে যখন আলো এসে পৌঁছয় পৃথিবীতে, তখন তাকে অনেকটা পথ পার হয়ে আসতে হয়। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে তবেই সে আমাদের চোখে এসে পৌঁছয়।

এই যে বিভিন্ন স্তর, এর ঘনত্ব সব সময়ে সমান নয়। ঢেলে জল বাড়ানোর বা ফুটিয়ে জল কমানোর উপরে যেমন দুধের ঘনত্ব কম বেশি হয়, তেমনি উষ্ণতার উপরেও বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের ঘনত্ব নির্ভর করে।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের উষ্ণতা সব সময়ে বদল হয়ে যাচ্ছে। আর এই উষ্ণতা বদলের জন্যে ঘনত্বও বদলাচ্ছে।

তা হলে যে বিভিন্ন বায়ুস্তরের ভেতর দিয়ে, আলোক-রশ্মি আসছে, তার ঘনত্বের পরিবর্তন চলতেই থাকে। আর আলোকবিদ্যার নিয়ম এই যে, মাধ্যমের ঘনত্ব যদি বদলায়, তা হলে আলোক-রশ্মিরও দিক বদলে যাবে। ফলে কোনও তারকা থেকে যে রশ্মি আসে, ক্রমাগত তার দিক বদলায়।

তা ছাড়া তারা থেকে আমাদের চোখে যে আলো এসে পৌঁছয়, তা খুবই অল্প। ফলে আমাদের চোখে-এসে-পড়া আলোক-রশ্মির সামান্য দিক-পরিবর্তনও আমাদের বেশি করে নজরে আসে। তাই তারারা মিটমিট করে বলে মনে হয়।

গ্রহেরা কিন্তু আমাদের চোখে এরকম মিটমিট করে না। তারাদের তুলনায় গ্রহেরা আছে পৃথিবীর অনেক কাছে। আর গ্রহ থেকে যে আলো আসছে তা পরিমাণে অনেক বেশি। এই জন্যে গ্রহের আলো স্থির বলে মনে হয়।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

জীবন্ত ফসিল : ওকাপি আর জিরাফ

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে অনেক বছর আগে পৃথিবীর বুকে যে-সব আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণী ঘুরে বেড়াত, তাদের অধিকাংশই আজ বিবর্তনের পরিণামে হয় লুপ্ত, নয় তো এমন বদলে গেছে যে, এখনকার চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই অতীতে তাদের রূপ কেমন ছিল। তবে এই ধারার ব্যতিক্রমও আছে। কিছু প্রাণী একই চেহারায় টিকে গেছে বর্তমান শতক পর্যন্ত। তাদের তাই বলা হয় 'জ্যান্ত ফসিল'। টুয়াটারা গিরগিটি, সিলাকান্থ মাছ কি জিরাফের জ্ঞাতিভাই ওকাপি (ওকাপিয়া জনস্টনি) এই ধরনের জীব। এমনকী, জিরাফও বিবর্তনকে দীর্ঘদিন ফাঁকি দিয়ে বেঢপ, খাপছাড়া চেহারা নিয়ে আফ্রিকার সাভানা তৃণ-প্রান্তরে, ক্রান্তীয় অঞ্চলে দিব্যি টিকে রয়েছে। তাদের চেহারা যেমনই হোক, টিকে থাকার ক্ষমতা অসাধারণ।

অথচ, আমরা এই বিচিত্র জীবটি সম্পর্কে কত কম জানি। যেমন, দীর্ঘদিন জল পান না করেও ওরা বেঁচে থাকতে পারে। মারাত্মক ঘুমপাড়ানি মাছি সিসির কামড়ে ওদের কিছু হয় না। অথচ গৃহপালিত পশুরা কাবু হয়ে পড়ে। জিরাফ দাঁড়িয়ে ঘুমোয়; তাও মাত্র কয়েক মিনিট। এমন কষ্টসহিষ্ণু জীব খুব কমই আছে। অথচ চিড়িয়াখানায় ওদের বাঁচিয়ে রাখা শক্ত। জিরাফের একমাত্র জাতভাই ওকাপিও ক্রান্তীয় আফ্রিকার গহন অরণ্যে ছোট দল বেঁধে থাকে। জিরাফের সঙ্গে মানুষের পরিচয় কমপক্ষে তিরিশ হাজার বছর। সাহারা মরুভূমির একপ্রান্তে সম্প্রতি এমন কিছু প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র আবিষ্কার হয়েছে, যাতে দেখা যায় আদি-মানবেরা জিরাফ ও ওকাপি শিকার করছে। ওই ছবি তিরিশ হাজার বছরের পুরনো। তবে জিরাফ আফ্রিকার আদি বাসিন্দা নয়। তারা প্রথমে বাস করত এশিয়া ও ইউরোপে। রাশিয়া, গ্রিস, এশিয়া মাইনর, ভারত ও চিনে জিরাফের পূর্বপুরুষ শিভাথেরিয়ামের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। ওই জীবটির চ্যাপ্টা ও বাঁকা শিং ছিল। প্লাইসটোসিন পর্বে ওরা দুই মহাদেশ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। আফ্রিকায় তাদের বংশধরেরা কোনওক্রমে টিকে থাকে। এরা তৃণভোজী ও রোমন্থক জীব। প্রথমে লম্বা ও খাটো গলার দু'রকম জিরাফ ছিল। তার থেকেই জিরাফ ও ওকাপির সৃষ্টি। খ্রিস্টজন্মের দু'হাজার বছর আগে মিশরে জিরাফকে পশুশালায় রাখা হয়েছিল। তার প্রাচীন কিছু ছবিও পাওয়া গেছে।

জিরাফ

জিরাফ আফ্রিকার আদি বাসিন্দা নয়। তারা প্রথমে বাস করত এশিয়া ও ইউরোপে। রাশিয়া, গ্রিস, এশিয়া মাইনর, ভারত ও চিনে জিরাফের পূর্বপুরুষের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে

৪৬ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে রোমক সেনাপতি জুলিয়াস সিজার আফ্রিকা থেকে প্রথম স্বদেশে জিরাফ নিয়ে আসেন। জলপথে, বহু কষ্টে ওই জীবটি আনা হলেও তা বেশি দিন বাঁচেনি। অষ্টাদশ শতকে ফরাসি প্রাণী-বিজ্ঞানী বুফোঁ ওই বিচিত্র প্রাণীর নামকরণ করেন 'জিরাফে'; তাঁর গ্রন্থে জিরাফের প্রথম আধা-বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা ও একটি ছবিও পাওয়া যায়।

আসলে, 'জিরাফিদেঈ' গোত্রের অধীন দুটিমাত্র প্রজাতি—জিরাফ ও ওকাপি। আকারে, স্বভাবে, বাস্তু নির্বাচনেও তাদের মধ্যে কিন্তু বিশেষ মিল নেই। জিরাফ থাকে দল বেঁধে; তার নিবাস দিগন্তপ্রসারী সাভানা প্রান্তরে ও মরুসীমায়। তার প্রিয় খাদ্য অ্যাকেশিয়া বা বাবলাগাছের পাতা, মিমোশাগাছের ডাল-বাকল। মাসাই জিরাফ পৃথিবীর উচ্চতম (ছয় মিটার) প্রাণী। অন্যদিকে ওকাপি থাকে ছোট পরিবারের সঙ্গে, গহন ক্রান্তীয় অরণ্যে। অন্ধকারে, ভ্যাপসা গরমে তার দিন কাটে। জিরাফের তুলনায় তার উচ্চতা নিতান্তই কম (দেড় মিটার)। তার দৃষ্টিশক্তিও জিরাফের তুলনায় নেহাতই ক্ষীণ। তবে প্রখর শ্রবণ ও ঘ্রাণ-শক্তির সাহায্যে ওকাপি সেই অভাব অনেকটা পুষিয়ে নেয়। তার প্রিয় খাদ্য চিরহরিৎ অরণ্যের কচি, সবুজ পাতা। গায়ের রঙ ও দেহের গঠনও দুই জ্ঞাতির দু'রকম।

তবু মিল কি একেবারেই নেই? আছে। প্রথমত, দু'জনেই রোমন্থক। দু'জনের মাথা ও কানের গড়ন এক রকম। দু'জনের মাথাতেই চামড়ায় ঢাকা ছোট শিং আছে। দু'জনের মুখেই ওপরের পাটির সামনের দিকে দাঁত নেই। কশের দাঁত ভোঁতা ও শক্ত। দু'জনের জিভই অস্বাভাবিক রকম লম্বা, আর খুশিমতন তা গোটানো যায়। জিরাফের ক্ষেত্রে সরু, লম্বা জিভের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ ইঞ্চি। দু'জনের গলাই

দেহের অনুপাতে লম্বা। দু'জনেই প্রায় বোবা, বিশেষ সাড়াশব্দ করে না। পিছনের দু'পায়ের তুলনায় দু'জনেরই সামনের পা দুটি লম্বায় বড় ; তাই পুকুর-ডোবা থেকে জল খাওয়ার সময় দু'জনকেই দু'পা দু'পাশে ফাঁক করে লম্বা গলা বাড়িয়ে দিতে হয়। ওই সময় দুজনের কপালেই দুর্ভোগ জোটে। কারণ ওদের অসহায় ভঙ্গির সুযোগ নিয়ে সিংহ বা চিতাবাঘ ঠিক ওই সময় ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্য সময়ে অবশ্য সিংহ জিরাফের কাছে ঘেঁষে না। কারণ, ওদের পিছনের দু'পায়ে অসম্ভব জোর। সেই পায়ের এক লাথিতে ওরা সিংহের খুলি ফাটিয়ে দিতে পারে!

জিরাফের চামড়া প্রায় এক ইঞ্চি পুরু। ঘিয়ে রঙের জমির ওপর লালচে-খয়েরি রঙের নকশা দেখা যায় প্রায় সারা গায়ে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের জিরাফের ক্ষেত্রে সেই নকশা প্রায় জ্যামিতিক, আর তার রঙ বেশ গাঢ়। কিন্তু মরুসীমায় অতি-দীর্ঘকায় যে মাসাই জিরাফের বাস, তাদের গায়ের নকশা পাতার আকারের ; তার রঙও হাল্কা। জিরাফের পুরু ও নমনীয় চামড়া থেকে খুব ভাল ও দীর্ঘ লাগাম বানানো যায়। সেই কারণে গত শতকে হাজারে-হাজারে জিরাফ মারা হয়েছে। তার মাংসও অনেকের প্রিয়। তবে এখন আর তা আস্বাদ করার উপায় নেই। তিন উপ-প্রজাতির জিরাফই এখন সংরক্ষিত প্রাণী। ওকাপি হননও নিষিদ্ধ।

ওকাপিকে দূর থেকে দেখায় গাঢ় বাদামি রঙের ঘোড়ার মতো। অনেকটা সেই কারণেই পর্যটক হেনরি স্ট্যানলি গত শতকের শেষে ঘোড়ায় চেপে যখন ইতুরি নদীর কাছাকাছি পিগমি আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছন, তখন তারা অন্য এলাকার আদিবাসীদের মতো ঘোড়া দেখে অবাক হয় না। নির্বিকার ভাবে বলে যে, এমন জীব গহন অরণ্যে তারা বিস্তর দেখেছে! বলাবাহুল্য, স্ট্যানলি ওই আজগুবি কথা একটুও বিশ্বাস করেননি। কারণ আফ্রিকার জঙ্গলে আর যে জীবই থাক, ওয়েলার ঘোড়া ছিল না। তবে পিগমিরা নিতান্ত মিথ্যেও বলেনি। ওরা আসলে ওকাপিকেই বোঝাতে চেয়েছিল।

যাক সে কথা। ওকাপি কিন্তু সভ্য মানুষের অগোচরেই পড়ে ছিল দীর্ঘকাল। জ্ঞাতিভাই জিরাফের মতো সে প্রচার পায়নি। অবশেষে ১৯০১ সালে উগাণ্ডার গভর্নর সার হ্যারি জনস্টন ওকাপির চামড়া ও মাথার খুলি পরীক্ষার জন্যে বিলেতে পাঠালে বিজ্ঞানীদের টনক নড়ে। তাঁরা উগাণ্ডার জঙ্গলে ওকাপি ধরতে লোক পাঠান। ১৯২৮ সালে

ওকাপি

১৯০১ সালে উগাণ্ডার গবর্নর সার হ্যারি জনস্টন ওকাপির চামড়া ও খুলি পরীক্ষার জন্য বিলেতে পাঠালে বিজ্ঞানীদের টনক নড়ে, তাঁরা উগাণ্ডার জঙ্গলে ওকাপি ধরতে লোক পাঠান

অ্যান্টওয়ার্প পশুশালায় একটি ওকাপিকে সুস্থ অবস্থায় কিছুকাল রাখা সম্ভব হয়েছিল। তার আগে গায়ে পোকা লাগায় ধরে-আনা সব ওকাপিই অকালে মারা পড়ে।

ওকাপির কোমরে ও পায়ে যে সাদা রঙের আড়াআড়ি ডোরা দাগ আছে, সেটা ঘন জঙ্গলের আলোছায়ার সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে, খুব কাছে না গেলে তার হদিস মেলে না। ওকাপি জিরাফের মতোই ঘণ্টায় ৫০ কি· মি বেগে ছুটতে পারে। তবে জিরাফের মতো সে সহজে দম-ছুট হয় না। সিংহ তাই দীর্ঘ সময় ধরে জিরাফকে দৌড় করায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বেশ খানিকটা ছোটার পর পরিশ্রান্ত জিরাফ সিংহ-দলের আক্রমণের আগেই হার্ট ফেল করে মারা পড়েছে।

তবু সব স্থলচর প্রাণীর মধ্যে জিরাফের হৃদ্‌যন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র সবচেয়ে জোরদার। প্রায় দু'মিটার উঁচু লম্বা গলার জন্যে হৃদ্‌যন্ত্রকে প্রবল বেগে রক্ত পাম্প করতে হয় ; তা না হলে মগজে রক্ত গিয়ে পৌঁছবে না। আবার দেহের স্বাভাবিক উচ্চতার তুলনায় মাথাটা ছ'মিটারের কাছাকাছি নামালে (যেমন নিচু হয়ে জল খাওয়ার সময়) মগজে রক্তক্ষরণ হওয়ার ভয়! তাই মগজে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালন ঠেকানোর জন্যে ওদের শিরায় বিশেষ সঙ্কোচনক্ষম কিছু ব্যবস্থা আছে। সেটা রক্তের স্বাভাবিক চাপ খানিকটা ঠেকায়।

আশ্চর্যের কথা, মানুষের গলায় সবসুদ্ধ যে ৭টি মেরুদণ্ডের কশেরুকা বা 'সারভিক্যাল ভার্টিব্রা' আছে, জিরাফ আর ওকাপির লম্বা গলাতেও আছে ঠিক সেই কটা! এটা প্রাণী-রাজ্যের আর এক বিস্ময়।

জিরাফ আর ওকাপির সংসারে পুরুষের প্রাধান্য। একটি দঙ্গলে দুটি পুরুষ কর্তা হতে চাইলে লড়াই বাধে। সে লড়াইয়ে প্রধান অস্ত্র গদা বা হাতুড়ির মতো লম্বা গলা। জিরাফের বড় মাথাটির ওজন ৪০ কে· জি·। সেটা দিয়ে প্রতিপক্ষকে সে আঘাত হানে। জিরাফ বা ওকাপি, চরম বিপদে পড়লেও, ডাকে না। তবে খুশির সময় মৃদু আওয়াজ করতে পারে। তাই ওদের বোবা-অপবাদ ঠিক নয়।

জিরাফ-ওকাপির মাথায় চামড়ায় মোড়া ও লোমে ঢাকা দুটি থেকে পাঁচটি পর্যন্ত খাটো শিং দেখা যায়। ওই শিং জন্মগত। স্ত্রী-পুরুষ সব জিরাফের শিং থাকলেও স্ত্রী-ওকাপির শিং নেই। অধুনালুপ্ত প্রাচীন জীব 'হেরাডোথেরিয়ামে'র সঙ্গে ওকাপির এত বেশি মিল যে, তাকে ও তার জ্ঞাতিভাই জিরাফকেও কেউ কেউ 'জ্যান্ত ফসিল' বলেন। প্রাণী-রাজ্যে ওদের কোনও তুলনা নেই।

বন্ধুর নাম পিঁপড়ে

অধীর বিশ্বাস

পিঁপড়েগুলো ঘুরঘুর করছে। দেখলে মনে হয় বারান্দার মাটি খুঁড়ে ফেলবেই। চৌকাঠের পাশ দিয়ে, বুড়ো পেটমোটা খয়েরি রঙের পিঁপড়েটা মাটি শুঁকে শুঁকে পাক দিচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে নিজেরই খিদে পেয়ে গেল, আর ওরা তো সব দুধের বাচ্চা। দরজার চৌকাঠে উঠতে দু'বার পা পিছলে পড়েও গেল। যখন এল তখন মাথা উঁচু করে, ঘাড় বেঁকিয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। তাকায় আর ভাবে—আমাদের রতনবাবু ?

রোজ খুব সকালেই রতন ঘুম থেকে উঠে পড়ে। চোখ মুছে কালির দোয়াতের ঢাকনা খুলে একটা মশার পাখনা কিংবা পা তুলে পটের নীচে খুঁটিটার গোড়ায় দিয়ে আসে। তারপর আর কিছু করতে হয় না রতনকে।

বাড়ির পেছনে পছন্দমতন আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে সোজা নদীর ঘাটে চলে যায়। চিবিয়ে-টিবিয়ে দাঁতনটাকে সরু করে। সেটা তখন ছড়িয়ে পড়ে দাঁতের ওপর। রতন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজে।

ফিরতে একটু দেরিই হয়। এটুকু তো দেরি হবেই। বাটামে ঝোলানো গামছায় মুখ-হাত-পা মুছতে মুছতে রতন দ্যাখে পিঁপড়েগুলোকে। মাঝখানে ওদের মা। এতগুলো পিঁপড়ের ভেতর আলাদা করে চেনা যাবেই। দেখলে মনে হয়, আহা, বাচ্চাদের জন্য কত কষ্ট করে উঠে এসেছে এতটা।

রতনদের বারান্দা বেশ উঁচু। নীচে দাঁড়িয়ে দেখে বুকসমান বারান্দা। একপাশে চটার বেড়া। হাতলভাঙা চেয়ার। ওর পাশেই রতন সকাল-সন্ধেয় পড়তে বসে। আর ওখানে বস্তায় বসে একটা একটা করে দোয়াত থেকে মশা ফেলে দেয়। ঝাঁক-পিঁপড়ে। পিঁপড়েদের মধ্যে এ ওর মুখ শুঁকে দু'তিনজন নিয়ে চলে মশাটা। পটের নীচে। ওখানে ওদের বাসা।

এমনভাবে রতন অনেকদিন হল তাদের খাবার দিচ্ছে। একদিন বারান্দায় পড়তে বসেছে, সেই সময়ে তার গায়ে একটা মশা বসে মনের সুখে রক্ত খাচ্ছিল। জ্বালা করে উঠতেই আলতো করে থাপ্পড় মারল রতন। আর মারতেই মরে গেল মশাটা। কিন্তু ও এত রক্ত খেয়েছে যে, মশাটার ওপর রতনের বেজায় রাগ হল। সে একটা-একটা করে ওর পা ছিঁড়ল। পাখনা খুলে নিল। তারপর রক্ত-খাওয়া পেটটা আলাদা করতেই দেখে, দু'একটা পিঁপড়ে, যারা গায়ে উঠলে সুড়সুড়ি লাগে, যে পিঁপড়ে কামড়ায় না, সেই পিঁপড়েরাই ছিঁড়ে-ফেলা পা মুখে পুরে খুব খুশিমনে এগিয়ে যাচ্ছে। এ-সময় একটু দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে হল রতনের। চলার সময় মশার পা আঙুল দিয়ে চেপে ধরল। আর ধরলেই কি নড়তে পারে ? অনেক টানাটানি চলল। মুখ থেকে ছেড়ে দিল। হাজার হোক খাবার লোভ। আবার পিঁপড়েটা শুঁকে-শুঁকে কামড়ে ধরে। আবার টানাটানি। রতনের বেজায় হাসি পায়। আঙুলটা আলগা করে। চেপে ধরে। তখন পিঁপড়েটার বুঝি রাগ হয়। ছেড়ে

দিল মশা। দিয়ে কী তিরতির এগিয়ে যাওয়া!

রতনের অতশত খেয়াল ছিল না। দোয়াতে হ্যাণ্ডেল চুবিয়ে হাতের লেখা করতে করতে দেখল—এ কী! এ যে একঝাঁক পিঁপড়ে! আগের পিঁপড়েটা গিয়ে নিশ্চয় বলেছে, আমাকে মারছে। খাবার আনতে দিচ্ছে না।

বাব্বা! এদের এত সৈন্যসামন্ত! রতন ইচ্ছে করেই মশাটাকে এদের দলে ছেড়ে দিল। তারপর গুণ্ডা-পিঁপড়ের দল শান্ত হয়। সেই থেকে রতন এমন সুড়সুড়ি-অলা পিঁপড়ে, যে পিঁপড়ে কামড়ায় না, ফুঁ দিলে উড়ে যায়, তাদের দেখলেই একটা মশা যেভাবেই হোক মেরে আনে। সে বুঝেছে, আসলে খাবার জন্যই অমন করে ওরা। অন্যদের দেয় না। কেননা বিষপিঁপড়ে, মাঝালি, ডেঁয়ো—সব পিঁপড়েই কামড়ায়। কামড়ালে হাত-পা ফুলে যায়। রতন সুড়সুড়ি-পিঁপড়েদের দলে হাত দিয়ে দেখেছে একদম কামড়ায় না। রতনের সঙ্গে খেলা করে। রতন তখন হাত-ঝাড়া দিয়ে বলে, ওরে, নাম। নাম। মশা দেব।

বাড়ির পিছনে ছোট্ট বাগান। চান করার আগে ভাটিগাছের ভেতর রতন চুপ করে গিয়ে বসে। বাগানে ভাঙা হাঁড়ি, হাঁড়িতে বৃষ্টির জল জমে কেমন লাল হয়ে থাকে। রতন চোখ তুলে দ্যাখে, মশার বাচ্চা কিলবিল করে নড়ছে। বড় মশারা তখন রতনকে কামড়ায়। গায়ে বসে তা প্রায় আট-দশটা একসঙ্গে। রতনের বাগানে ঢোকার পরই ওরা কেমন টের পেয়ে যায়। বিজ্ঞান বইয়ের ছবিতে সে অ্যানোফিলিস আর কিউলেক্স মশার ছবি দেখেছে। গায়ে বসার পর সেগুলোকে চিনতে চেষ্টা করে। উঃ, যা কামড়ায় না!

কষ্ট করে বসে থাকে রতন। কেননা, একবার হুল বসিয়ে রক্ত খেতে শুরু করলে আস্তে-আস্তে টুক্ করে থাবড়া দিলেই মরে পড়ে। দু'একটা উড়েও পালায় বই কী! তবু যেগুলো মারা পড়ে, তাদের সংখ্যাও কম নয়। পিঁপড়েদের খাওয়ানোর কথা মনে পড়লে ব্যথা করে না। জ্বালাটালা ভুলে যায় রতন।

. রোজ রোজ এমন করতে গিয়ে একদিন ধরা পড়ে গেছিল। বউদি জানালা দিয়ে দ্যাখেন ওর কাণ্ডটা। হেসে বলেছিলেন, "এমন কামড় খেয়ে কী সুখ পাস, রতন?"

দোয়াত দেখিয়ে রতন বলেছিল, "ওই যে কত মশা জমিয়েছি, বউদি। ওগুলো পিঁপড়েদের দেব। রোজ সকালে ওরা যে খেতে আসে!"

রতন বড়পুজোয় মামাবাড়ি গেছিল বেড়াতে। সঙ্গে বউদি। ওখানে পানের বরোজ আছে। তেঁতুলতলার স্কুলে রণদাদার সঙ্গে গেলে স্যার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমাদের ওখানে পাকা রাস্তা আছে? গান জানো?"

এই মামাবাড়ির বড় গাঙ দিয়ে লঞ্চ চলে। বড়-বড় ঢেউয়ে হাঁটু পর্যন্ত জল উঠে আসে। টাবুরে নৌকো দোল খায়। এমন মামাবাড়ি গিয়েও দু'দিন বাদেই মন-খারাপ করেছিল বাড়ির জন্য। কতদিন হয়ে গেছে! কতদিন পিঁপড়েদের খেতে দেয়নি রতন। এসব ভাবতে-ভাবতে চোখে জল এসে গেল।

বড়মামা বললেন, "কী হয়েছে? কে বকেছে?"

সবাই এসে দেখল, রতন মুখ লুকিয়ে ফোঁপাচ্ছে! মামা-দাদা অনেকেই আদর করল তাকে। রণদাদা বলল, "চল্। আজকে রাজাপুরের হাটে নিয়ে যাব।"

রতন চোখে আঙুল রেখে বলল, "বাড়ি যাব।"

কিছুতেই রতন মন-খারাপের কথাটা বলতে পারল না। সত্যি কথাটা বললে যদি সকলে হাসাহাসি করে!

শেষে মামা বললেন, "বউমা। তুমি ওকে নিয়ে যাও।"

বউদি মামাবাড়ি এসে কেমন মিশে গেছেন। বাড়ির মতন কাজ করছিলেন। মামার কথায় সায় দিয়ে বলেন, "ঠিক আছে। কালই যাব। আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, মামা।"

ঢাকা-রোডের মোড়ে যখন মোটরবাস থেকে নামল, তখন বিকেল। তারপর পায়ে হেঁটে অনেকটা পথ। রতনের আর কষ্ট নেই।

বাড়ি এসেই মামাবাড়ির নারকেল, সুপুরি বারান্দায় রেখে দৌড়ে ঘরে ঢুকে যায় রতন। বাবা বলেন, "কী রে, আজই চলে এলি যে! বউমা কোথায়?"

"ওই যে! আসছেন।" বলেই মাচার তলায় যেখানে মশা পুরে দোয়াতটা রেখে এসেছিল, সেটা এনে মুখ খুলে পটের নীচে নিয়ে গেল। গিয়ে উপুড় করে দিল দোয়াতটা।

বাড়িতে এখন আবছা অন্ধকার। একটু বাদেই রাত্তির হয়ে যাবে। তবু এখন যতটা দেখা যাচ্ছে, তাতে দেখল মশাগুলো সেভাবেই ছড়িয়ে রয়েছে। একটা পিঁপড়েও আসছে না। রতন তাকিয়ে দেখল নতুন খুঁটি বসানো। মাটি সরিয়ে খুঁজল পিঁপড়ের গর্ত। আবার খোঁজে।

বাবা বললেন, "কী করিস?"

"গর্ত দেখছি।"

"কিসের গর্ত?"

"আর বলেন কেন," বউদি বললেন, "এবার বুঝেছি।"

ততক্ষণে রতন হারিকেনটা নিয়ে এসেছে ঘর থেকে। আবার খুঁজছে খুঁটির আশপাশে। বাবা বলেন, "খুঁটিটায় একদম কিছু ছিল না। তুলে দেখি গোড়াটা একদম ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। রাজ্যির পিঁপড়ে এসে জড়ো হয়েছিল ওখানে। কত ডিম পেড়েছিল। আর দুদিন থাকলে চালাটা পড়ে যেত।"

রতন বাবার দিকে ফিরে চায়। কিছুই বলতে পারছে না। দোয়াতটা পড়ে আছে।

বাবা জিজ্ঞেস করেন, "কী রে, খুঁটিটা দিয়ে ভাল হয়েছে না?"

ছবি দেবাশিস দেব

মানে···স্বপ্ন দেখছিলাম···
দুঃস্বপ্ন···জলদস্যু···
বটে ?
একটু পাইপ টানলেই ঘুম কেটে যাবে !
টানো ।
যা বলছিলাম···ছ মাস আগে আমির যে সনদ দেন, আরব এয়ারের গুরুত্ব তার ফলে বেড়ে যায় । তারপর হপ্তা কয়েক আগে আরব এয়ারের সঙ্গে আমিরের ঝগড়া লাগে । অবস্থা তার ফলে ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায় ।
হঠাৎ গোটা দেশে দেখা দিল হাঙ্গামা । নাম-না-জানা এক বিমান-কোম্পানি বিদ্রোহীদের মদত দিতে লাগল । বিদ্রোহীরা ওয়াদেসদায় ঢুকে দখল করল ক্ষমতা ।
জঙ্গি বিমান আর যাত্রিবাহী ডিসি-৩ বিমান একই সূত্র থেকে এসেছে, এবং এটাই হচ্ছে বিস্ময়কর ব্যাপার সেনর অলিভেরা । তা ঝগড়াটার কারণ কী ?
তা আমি জানি না ।
যাক গে, এখন আমিরকে সাহায্য করা দরকার । তিনি কোথায় ?
পালিয়ে জেবেলে গিয়ে তিনি অনুগত উপজাতীয় লোকদের আশ্রয়ে আছেন ।
ওরে বাবা রে !
!
কী···কী···কী ব্যাপার ?
তোমার পাইপের আগুন দাড়িতে লেগে গিয়েছিল।
এবারে ঘুমোনো যাক । পরশু তোমাদের আমিরের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করব ।
ভাল কথা ।
দু'দিন বাদে···
সেপাই আসছে ! দেখেছ ?
কথা বোলো না !
ওরে বাবা !
?

লোহিত সাগরের হাঙর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

ডিক্সনের মেজাজ ঠিক নেই, তাই তাকে বসিয়ে দেওয়া হল

রোভার্স এখন দারুণ খেলছে !
প্যাকোকে দাও
কিন্তু ...
গোড়ালি দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে !
মারো, রয় !
কামানের গোলা
এক গোল শোধ !
রোভার্স আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে
রোভার্স ! রোভার্স !
লিঞ্চ দারুণ এগোচ্ছে !
জান লড়িয়ে দাও !
লিঞ্চ বল তুলে দিল প্যাকোর মাথায় ...
প্যাকো হেড নিয়েছে !
গোলে ঢোকাও
ঢুকেছে !
সমান-সমান !
কিন্তু রেফারি ইতিমধ্যে বাঁশি বাজিয়েছিলেন ...
হাফ-টাইমের বাঁশি বাজাবার পরে গোলটা হয়েছে !
হুররে !
সে কী !
দেখছি আজকে কপালটাই খারাপ !
যা বলেছ !
এর উপরে আবার ডিক্সনের ঝামেলা মেটাতে হবে !
সমস্যা অনেক
রোভার্স কি দ্বিতীয় গোলটা শোধ করতে পারবে ?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

ছোট্ট বন্ধুরা। দারুন উত্তেজনার মুহূর্তগুলি এসে গেছে...

বুস্ট অন্তরীক্ষ অভিযান

বিখ্যাত সব মহাকাশ অভিযান ও অভিযানের নায়কদের রঙ বেরঙের ছবি সংগ্রহ কর। এড্রইন অলড্রিন চাঁদে হাঁটছেন; ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা; মহাকাশে ভ্রমণকারী প্রথম প্রাণী লাইকা কুকুরটি এবং এরকম আরো কত ছবি!

উত্তেজনায় ভরা বুস্ট অ্যালবাম দেখতে দেখতে তোমরাও পাড়ি দিতে পার মহাকাশের মনোমুগ্ধকর জগতে।

মহাকাশ যাত্রার কাহিনী, ভবিষ্যতের অন্তরীক্ষ উপনিবেশ এবং সুদূরের নক্ষত্র ও গ্রহরাজি সম্পর্কে কতরকমের খবরই না চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

হ্যাঁ, তোমাদের খুশি হওয়ার মতো আকর্ষনীয় অনেক কিছু এতে আছে। সুতরাং মহাকাশযাত্রার হেলমেট পরে চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

অভিযান 1:

বিনামূল্যে কার্ড

প্রতি 500 গ্রামের প্যাকের সংগে একটি।

অভিযান 2:

12 পৃষ্ঠার এই অ্যালবামে আছে অন্তরীক্ষের আশ্চর্যময় জগতের চমৎকার চিত্র কাহিনী।

বিনামূল্যে অ্যালবাম

2 টি কার্ড সংগ্রহ করলে।

HMM-8726BEN

প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ

ইন্তি-বিন্তিকে কোথাও পাওয়া গেল না···

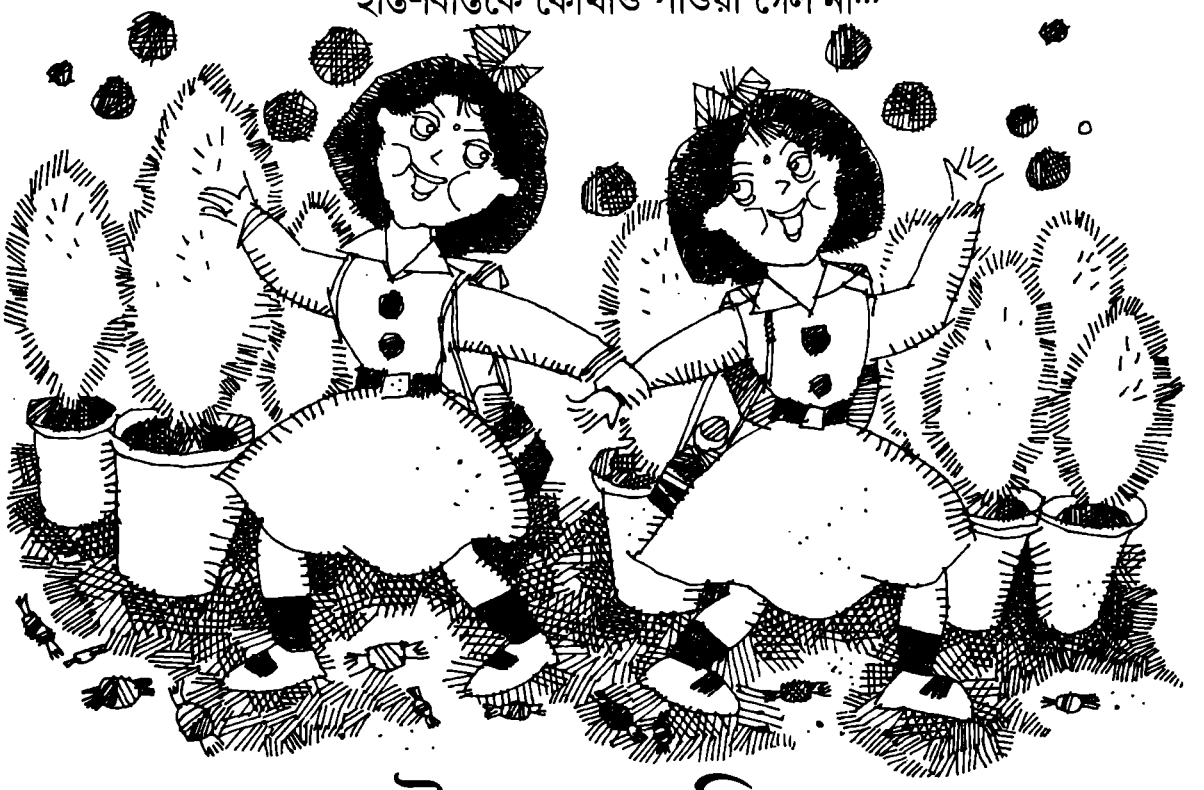

উৎসবের দিন

বাণী বসু

ইন্তি-বিন্তি রোজ স্কুলে যায় শিবুদার সঙ্গে। গায়ে লাল-সাদা স্কুল-জামা, পিঠে ব্যাগ। তাতে ছবির বই, পেনসিল-বাক্স, টিফিন-বাক্স। দু'জনের কাঁধ থেকে ঝোলে জলের বোতল। ইন্তিরটা লাল, বিন্তিরটা সবুজ। দু'জনের দু'রকম। ওরা যমজ তো ! পাছে একজন আরেকজনের এঁটো জল খেয়ে ফেলে, তাই মায়ের এই ব্যবস্থা।

স্কুল বসে সেই ভোর সাড়ে ছ'টায়। শেষ সাড়ে দশটায়। ইন্তি-বিন্তি এখন ক্লাস ওয়ানে উঠেছে। যোগ-বিয়োগ করতে পারে। নামতা বলতে পারে। কত সুন্দর-সুন্দর ছড়া বলতে পারে ! প্রথম প্রথম স্কুলে যেতে ওরা ভারী ঝামেলা করত। কান্নাকাটি, পেট-ব্যথা, কান-কটকট। এক বছর হয়ে গেল, কাজেই এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। যায় বটে, কিন্তু স্কুলে যেতে ওদের একদম ভাল লাগে না। ওদের ক্লাসের দিদিমণির নাম সঙ্ঘমিত্রাদিদি। দিদি বললে রেগে যান, আণ্টি বলতে হয়। কী সুন্দর দেখতে ! কিন্তু কী রাগী ! নিজে ওয়ান বি'র আণ্টির সঙ্গে সারাক্ষণ গল্প করবেন, অথচ ইন্তিরা একটু 'টকিং' করলেই ধমক ! নিজে এতখানি-খানি নখ রেখেছেন, কিন্তু ইন্তিদের নখ একটুখানি বড় হয়েছে কি হাত পাতো, স্কেলের বাড়ি খাও। আর খালি 'পুটিও হেডাউন, পুটিও হেডাউন', ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। পাখি বলে একটা মেয়ে আছে পুঁচকে মতন, সে 'হেডাউন' করতে করতে রোজ ঘুমিয়ে পড়ে। আর অমনি তাকে ডেকে তুলে টেবিল জিজ্ঞেস করেন। বেচারি ফোলা-ফোলা চোখে এদিক-ওদিক চেয়ে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফ্যালে। তার ওপর আছে আবার সুরেখা ভাটিয়া। সুযোগ পেলেই ইন্তি-বিন্তিদের টিফিন খেয়ে নেয়, বিশেষ করে যেদিন মা টফি, চানাচুর, শোনপাপড়ি এই সব ভাল ভাল জিনিস দেন। টিফিনের জন্যেই তো স্কুলে যাওয়া ! সেই টিফিনই যদি রোজ-রোজ হাওয়া হয়ে যায়, কার ভাল লাগে বলো তো !

তাই রোজই ইন্তি-বিন্তি বাড়ি আসে মুখ গোঁজ করে। বাড়ি এসেই ব্যাগ ছুঁড়ে দেয়, পা থেকে জুতো-মোজা হিঁচড়ে টেনে খোলে, জলের বোতলের নলটা মুখে লাগিয়ে চকচক চকচক করে জল খেতেই থাকে, খেতেই থাকে। মা যত বলেন, 'ওরে আর জল খাস না, এবার চান করবি, ভাত খাবি, খিদে নষ্ট হয়ে যাবে', ইন্তি-বিন্তি সে-সব শুনতে চায় না। আসলে চার ঘণ্টা ধরে মনের মধ্যে রাগ আর কান্না পুষে-পুষে এখন সবটাই দৌরাত্ম্যি হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু মা সে-সব কথা বুঝবেন কেন ? বলবেন, 'বাবা রে বাবা, সকাল থেকে একটু নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত পাইনি, কোথায় চান করে খেয়ে আমায় উদ্ধার করবে তা না।' ইন্তি-বিন্তি চেঁচিয়ে ওঠে, "উদ্ধা করব না, উদ্ধা করব না।" অমনি গালে ঠাস। তারপরেই ভ্যাঁ। এ প্রায় নিত্যকার ঘটনা।

সেদিন হল শিবুদার জ্বর। জ্বর গায়েই শিবুদা স্কুলে দিয়ে এল। পরদিন জ্বর আরও বাড়ল। ইন্তি-বিন্তির স্কুল যাওয়া হল না। খুব মজা। একদিন, দু'দিন, তিনদিন কামাই। মা বললেন, "সর্বনাশ ! ক'দিন পরেই অ্যানুয়্যাল পরীক্ষা, এখন কামাই হলে তো চলবে না !" কিন্তু বাবা বেরোন সাতটার সময়। কতদূর ট্রেনে করে অফিস যেতে হয়। মা'র পক্ষে তো

কোনওমতেই স্কুলে দিয়ে আসা সম্ভব নয়। কী হবে!

বাবা বললেন, "স্কুল তো বেশি দূরে না। বড় রাস্তাও পার হতে হয় না। ফুটপাথ দিয়ে চলে-চলেই পৌঁছে যাওয়া যায়। দু'জনে মিলে চলে যেতে পারবে না? আর আশপাশ থেকে নিশ্চয় আরও বাচ্চা যায়! কী রে ইন্তি-বিন্তি, পারবি না?"

ইন্তি-বিন্তি দেখল একটা নতুন ব্যাপারের উপক্রম হয়েছে। বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন পারব না?"

মা বললেন, "না বাপু! ছেলেধরা-টরা কত কী আছে! কী দরকার!"

বাবা বললেন, "আমাদের ছেলেমেয়েদের ধরে আর ছেলেধরাদের কী সুবিধে বলো? আমরা তো আর হাজার-হাজার টাকা র‍্যানসম দিতে পারব না!"

অতএব ঠিক হয়ে গেল, পরদিন ইন্তি-বিন্তি 'একা-একা'ই স্কুলে যাবে। মা ভাল করে শিখিয়ে দিলেন, "হাত-ধরাধরি করে যাবে, একদম হাত ছাড়বে না। রাস্তায় কারও সঙ্গে কথা বলবে না, কেউ ডাকলে সাড়া দেবে না, কেউ লজেন্স টফি দিতে এলে নেবে না। যদি কেউ হঠাৎ স্কুলে এসে বলে, মায়ের অসুখ করেছে বাড়ি চলো, তার সঙ্গে যেন অমনি চলে এসো না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব শিখিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, বুঝতে পেরেছিস তো?"

দু'জনে বলল, "হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যা।"

"বল তো কী বললুম!"

ইন্তি বলল, "কারুর সঙ্গে রাস্তায় কথা বলব না। মণিমাসি যদি বারান্দা থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, মা কেমন আছে, মুখ ফিরিয়ে গটগট করে চলে যাব।"

বিন্তি বলল, "কেউ লজেন্স-টফি দিতে এলে নোব না। কিন্তু যদি ফাইভ স্টার দেয়, তা হলে নোব।"

ইন্তি বলল, "স্কুলে যদি কেউ বলে, মায়ের অসুখ করেছে, বাড়ি চলো, তা হলে আসব না। বাবার অসুখ করেছে বললেই তক্ষুনি ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে চলে আসব।"

মা বললেন, "হায় ভগবান! এ কী সর্বনেশে কথা গো!"

বাবা বললেন, "ছাড়ো তো তুমি! ও সব কিছু শেখাবার দরকার নেই। ওরকম করলে ছেলেপুলে স্মার্ট হয় না। ছেড়ে দাও, ঠিক যাবে।"

শীতকালের ভোরবেলা। মা মোটাসোটা লাল সোয়েটার পরিয়ে দিয়েছেন, "দুর্গা! দুর্গা!" ইন্তি-বিন্তি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কী মজা! কী মজা! রোজ রোজ শিবুদা "হ্যাট, হ্যাট, এই উদিকে না, ইদিকে, উদিকে না, ইদিকে'" করতে-করতে যেন ছাগল তাড়াতে-তাড়াতে নিয়ে যায়। আজ কী সুন্দর। যেমন খুশি তেমন চলো। বাড়ির কাছেই দোলনা পার্ক। ওরা দেখল একটা গাছের পাতা একদম খসে গেছে। ট্যারা-ব্যাঁকা ডাল নিয়ে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, যেন গল্পের অষ্টাবক্র মুনি। ওরা আরও এগিয়ে যাচ্ছে। ইন্তি বলল, "দ্যাখ, একটা লোক দাঁতন করছে। এক্ষুনি আমাদের লজেন্স দিতে চাইবে। তুই নিবি?"

বিন্তি বলল, "তুই আগে জিজ্ঞেস করবি মুড়ি-লজেন্স কি না!"

কিন্তু লোকটা কিছুই বলল না। একদিকে চলে গেল। টিং টিং করে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে ক্যারিয়ারের সঙ্গে বড় বড় দুধের ড্রাম বেঁধে গোয়ালারা চলে গেল। আরও কতকগুলো লোক চলে গেল পিঠে থলি নিয়ে। বিন্তি বলল, "ওরা ছেলেধরা। থলি এখন ভরা তো! তাই আমাদের নিল না। শিগগির চল। এই ছেলেগুলোকে ঢেলে দিয়েই আমাদের নিতে আসবে।"

এমন সময় ওরা দেখল ওদের স্কুলের পোশাক-পরা আরও কতগুলো বাচ্চা হাসতে হাসতে যাচ্ছে। ইন্তি বেশি স্মার্ট। বলল, "এই, তোরা আমাদের স্কুলে পড়িস?"

ওরা হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ তো! তোরা তো ক্লাস ওয়ান-এর? আমরা তোদের চিনি।"

তখন ওদের মজাই হল। আর ছেলেধরার ভয় রইল না। ক্রমশই অলিগলি দিয়ে ডজনে-ডজনে ওদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা যেন কুয়াশায় ভাসতে-ভাসতে বেরিয়ে আসতে লাগল। উরি বাবা! কত! এই এত ছেলেমেয়ে ওদের রেনবো ইস্কুলে পড়ে? লাল সোয়েটার, লাল স্কার্ট, লাল হাফপ্যান্ট, পিঠে ব্যাগ, কাঁধে বোতল। সবাই মিলে কলকল কলকল করতে করতে চলল।

স্কুলে পৌঁছে দ্যাখে, ও মা! কী সুন্দর! লাল সবুজ শালুতে লেখা, 'ওয়েলকাম টু দা ফেত্।' কত রকমের কাগজের পতাকা, শিকলি, বেলুন দিয়ে স্কুল-গেটটা সাজানো। রেনবো তো রেনবোই। গোছা গোছা রঙিন গ্যাস-বেলুন চারদিক থেকে উড়ছে। কত স্টল! নাগরদোলা! মেরি-গো-রাউণ্ড! মেলা নাকি রে বাবা! ইন্তি-বিন্তি তাদের সঙ্গের ছেলেমেয়েগুলোকে জিজ্ঞেস করল, "এসব কী রে?"

ওরা বলল, "তোরা কি অ্যাবসেন্ট ছিলি? জানিস না আজ উৎসব। ওই দ্যাখ আন্টিরা সব যেমন-ইচ্ছে তেমন সেজে সেজে ঘুরছেন।"

সত্যিই ওরা দেখল জমাট কুয়াশার মধ্যে-মধ্যে আন্টিরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরে, স্কার্ট পরে, কিন্তু প্রত্যেকের মাথায় একটা করে মুখোশ। খরগোশ, কাঠবিড়ালি, হরিণ এই সবের। উৎসব তো! ভীষণ আনন্দ আজ ইন্তি-বিন্তির। সুরেখা ভাটিয়া, পাখি গাঙ্গুলি, কি রজনী গোসওয়ামিকে দেখতে না পেলেও ওদের কোনও অসুবিধে হল না। টয়-ট্রেনে চড়ে কতদূর ঘুরে এল, কাঠের ঘোড়া, কাঠের জিরাফের গলা জড়িয়ে বাঁই-বাঁই করে ঘুরল। সঙ্ঘমিত্রা আন্টি (অবশ্য না-ও হতে পারেন, তবে গলা শুনে মনে হল উনিই) ওদের ডেকে আইসক্রিম খাওয়ালেন, ললিপপ হাতে দিলেন। লাল নীল প্লাস্টিকের ঝুড়ি থেকে মুঠো মুঠো টফি তুলে আন্টিরা চারদিকে টফির লুঠ দিতে লাগলেন। যে যত পারল, কুড়িয়ে নিল। কী সুন্দর নাচ হল তারপর। ইন্তিরা যদিও নাচটা জানে না, তবু আন্টি বললেন, "পা মিলিয়ে দেখে দেখে নাচো। ঠিক হয়ে যাবে।" গোল-গোল ঝাউগাছগুলোকে ঘিরে ঘিরে হেলেদুলে অন্য কত ছেলেমেয়ের সঙ্গে ইন্তি-বিন্তি নাচতেই লাগল, নাচতেই লাগল।

ঢং করে সাড়ে দশটা বাজল ঘড়িতে। মা গরম জল বসালেন। এক্ষুনি দুই মূর্তি ঝড়ের মতো এসে পড়বে। চান করতে চাইবে না, খেতে চাইবে না। যত রকমের দুষ্টুমি আছে, সব একসঙ্গে আরম্ভ করে দেবে। ড্রেসিং-টেবিল থেকে লিপস্টিক, পাউডার ড্রয়ারে ভরে চাবি দিয়ে ফেললেন। এগারোটা বাজল। বারোটা বাজল। মা তাড়াতাড়ি শাড়ি পালটে রেনবো কিণ্ডারগার্টেনে ছুটলেন। স্কুল কখন বন্ধ হয়ে গেছে। দরোয়ানজি বড় আন্টির ঠিকানা দিল। বড় আন্টি সঙ্ঘমিত্রাদিদিকে ফোন করলেন। সঙ্ঘমিত্রাদিদি বললেন, "অর্পিতা, অস্মিতা? তারা তো আজ বেশ ক'দিন স্কুলে আসছে না? আজও আসেনি।" বাবার অফিসে টেলিফোন গেল। দুজনে মিলে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে লাগলেন। হাসপাতাল, থানা, খবরের কাগজের আপিস ···

ইন্তি-বিন্তিকে কোথাও পাওয়া গেল না।

দিন মনে হয় কাটবে না, তবু তো দিন কেটে যায়! একটি একটি করে দুঃসহ তিনটে মাস কাবার হয়ে গেল। ইন্তি-বিন্তিদের বাড়ির মধ্যে ঢুকলে দেখবে এখানে খানিকটা ছাড়া-কাপড় পড়ে আছে, ওখানে পথের মাঝখানে একটা বালতি বসানো। পর্দাগুলো কতদিন কাচা হয়নি, ঘরের কোণে-কোণে ঝুল জমে আছে। কোণের শোবার ঘরে বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে শুয়ে রয়েছেন ইন্তি-বিন্তির মা। শুকনো মুখ। পাশে দাঁড়িয়ে ইন্তি-বিন্তির বাবা। উশকো-খুশকো চুল। শুকনো মুখ। হাতে একটা দুধের গ্লাস। বলছেন, "এটা খেয়ে নাও। একদম না খেলে কী করে চলবে বলো?"

"আমার যে গলা দিয়ে কিছুতেই নামছে না।"

"এটা তো লিকুইড, ঢক করে খেয়ে ফেলো ···"

এমন সময় বাইরে ভীষণ জোরে চ্যাঁ-অ্যাঁ করে বেল বেজে উঠল। বাবা বললেন, "বেলা এগারোটার সময় আবার কে এল?" তারপরেই নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকল ইন্তি-বিন্তি। পরনে লাল সাদা স্কুল-জামা, কাঁধে জলের বোতল, পিঠে বইয়ের ব্যাগ। পেছনে চোখ-গোল শিবুদা।

ইন্তি চেঁচামেচি করে বলে উঠল, "ঠিক ওইরকম করতে হবে মা আমাদের জন্মদিনে।"

বিন্তি বলল, "হ্যাঁ মা, ঠিক ওইরকম মুখোশ চাই। না রে ইন্তি?"

মা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। বাবা বললেন, "কোথায় ছিলি? কোথা থেকে এলি?"

ইন্তি বলল, "বা রে, স্কুল থেকে আসছি তো! কী সুন্দর ফেত্ উৎসব ছিল আজ! আমরা তিনদিন অ্যাবসেন্ট ছিলুম তো, তাই জানতুম না। কী মজা করেছি!"

বিন্তি অবাক হয়ে বলল, "মা, কাঁদছ কেন? মা, এত রোগা হয়ে গেছ কেন? মা, মা, তোমার কী হয়েছে?"

অনেক প্রশ্ন করা সত্ত্বেও ইন্তি-বিন্তির সেই একই উত্তর। ওরা আজ সক্কালবেলায় হাত-ধরাধরি করে স্কুল গিয়েছিল। স্কুলে ফেত-উৎসব ছিল। আইসক্রিম, টফি, চকোলেট, ললিপপ, ক্যাণ্ডিফ্লস এই সব খেয়েছে, নেচেছে, গেয়েছে। ছড়া বলেছে, খেলনা-ট্রেনে ঘুরেছে। ফেতের জন্যে একটু হয়তো দেরি হয়ে গেছে। তাতে এত কাঁদবারই বা কী হয়েছে, আর এত রোগা হয়ে যাবারই বা কী হয়েছে!

ছবি : দেবাশিস দেব

বস্কোম্ব ভ্যালিতে খুন

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আমি আর আমার স্ত্রী সকালবেলায় বসে বসে চা খাচ্ছিলুম। এমন সময় আমাদের কাজের মেয়েটি একটা টেলিগ্রাম নিয়ে হাজির হল। টেলিগ্রাম করেছে শার্লক হোমস। সে লিখেছে :

"দু'চার দিনের জন্যে আসতে পারবে ? বস্কোম্ব ভ্যালিতে যে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে সে ব্যাপারে তদন্ত করবার জন্যে ওই অঞ্চল থেকে ডাক এসেছে। যদি আসো তো খুশি হব। ওই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য আর আবহাওয়া খুব ভাল। প্যাডিংটন থেকে ১১-১৫ মিনিটের গাড়িতে যাব।"

আমার স্ত্রী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ভাবছ ? যাবে নাকি ?"

"কী করব বুঝতে পারছি না। হাতে এখন অনেকগুলো রুগি রয়েছে।"

"তুমি আনস্ট্রাথারকে বলে যাও। সে তোমার রুগিদের চিকিৎসা করবে। তোমার শরীরটা ক'দিন দেখছি একটু শুকনো দেখাচ্ছে। দু'চারদিন একটু বাইরে থেকে ঘুরে এলে তোমার পক্ষে ভালই হবে। সবচেয়ে বড় কথা, শার্লক হোমসের তদন্তে তোমার এত আগ্রহ যখন, তখন তোমার যাওয়াই উচিত।"

"শার্লক হোমসের সঙ্গে থেকে আমার নিজেরও কম লাভ হয়নি," আমি হেসে জবাব দিলুম। তারপর বললুম, "যেতে হলে কিন্তু এখনই গোছগাছ করতে হবে। হাতে আর মোটে আধঘন্টা সময় আছে।"

মিলিটারি-ডাক্তার হিসেবে আমি কিছুদিন আফগানিস্থানে ছিলুম। সেই সময়ে আমাদের ক্যাম্পে থাকতে হত, আর হঠাৎ প্রায় বিনা নোটিসেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হত। এর ফলে আমার একটা ভাল শিক্ষা হয়েছিল। সেটা হল যে কোথাও যেতে-টেতে হলে আমি খুব চট করে তৈরি হতে পারি। আর আমার মোটঘাটও হয় যৎসামান্য। তার ফলে আমি আধঘন্টার অনেক আগেই আমার স্যুটকেস নিয়ে একটা ভাড়া-গাড়িতে চেপে প্যাডিংটনের দিকে রওনা হলুম। শার্লক হোমস প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল। শার্লক হোমস এমনিতেই রোগা আর লম্বা। তার ওপর মাথার ক্যাপ আর গায়ের লং কোটের জন্যে হোমসকে আরও লম্বা আর রোগা দেখাচ্ছিল।

আমাকে দেখে হোমস বলল, "যাক ওয়াটসন, তুমি এসেছ। খুব ভাল হয়েছে। সঙ্গে যদি এমন কেউ থাকে যার ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারি, তা হলে আমার কাজের সুবিধা হয়। স্থানীয় লোকেরা হয় কোনও কর্মের নয়, নয়তো তারা কোনও-না-কোনও পক্ষের লোক। তুমি গাড়িতে উঠে দুটো জানলার-ধারের জায়গা রাখো। আমি টিকিট কেটে আনি।"

আমরা যে কামরাটায় উঠলুম সেটাতে আর কোনও যাত্রী ছিল না। হোমস এক বাণ্ডিল খবরের কাগজ সঙ্গে করে এনেছিল। গাড়ি ছাড়তেই সে খবরের কাগজগুলো পড়তে লাগল। মাঝে-মাঝে একটা কাগজে কী-সব টুকে নিচ্ছিল। আবার কখনও-কখনও গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করছিল। যখন আমরা রেডিং-এ পৌঁছলুম, হোমস খবরের কাগজগুলো তাড়া বেঁধে একপাশে সরিয়ে রাখল।

হোমস আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এই কেসটার সম্বন্ধে তুমি কি কিছু জানো ?"

"না, কিছুই জানি না। কয়েকদিন কাজের এমন চাপ পড়েছিল যে, খবরের কাগজই ভাল করে পড়তে পারিনি।"

"লন্ডনের কাগজে এই ব্যাপারটার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খবর বেরোয়নি। এতক্ষণ ধরে সব কাগজ পড়লুম, যাতে সব কিছু সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। যেটুকু জানতে পেরেছি তার থেকে বুঝেছি যে, এটা সেই ধরনের সহজ মামলা, যার ফয়সালা করা খুবই কঠিন কাজ।"

"এটা কি সোনার পাথরবাটি গোছের ব্যাপার হল না ?"

"হতে পারে, তবে কথাটা ঠিক। কোনও কেস যদি খুব অভিনব বলে মনে হয় তো জানবে যে, সেই অভিনবত্বটাই একটা বড় সূত্র। যে কেস যত বেশি সাদামাটা, যত বেশি সরল বলে মনে হবে জানবে সেই কেসে আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া তত বেশি শক্ত। এই ব্যাপারটায় যে লোকটি খুন হয়েছে তারই ছেলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে।"

"এটা তা হলে একটা খুনের তদন্ত," আমি বললুম।

"হ্যাঁ, সেই রকমই অনুমান করা হচ্ছে। তবে যতক্ষণ না আমি নিজের চোখে সব দেখছি ততক্ষণ এটা খুনের তদন্ত কি না সে বিষয়ে আমি কোনও মতামত দেব না। তবে ইতিমধ্যে এই রহস্যজনক ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমি যা জানতে পেরেছি তা তোমাকে সংক্ষেপে বলছি।

"হারফোর্ডশায়ারে রস-এর কাছে বস্কোম্ব ভ্যালি একটা বড় গ্রাম। মিঃ জন টার্নার নামে এক ভদ্রলোক ওই গ্রামের একজন বেশ ধনী লোক। অনেক জমির মালিক। টার্নার কিছুদিন অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন। সেখানে তিনি প্রচুর টাকা-পয়সা উপার্জন করে কয়েক বছর হল ফিরে এসে ওই গাঁয়ে বাস করছেন। উনি ওঁর হেদারলির একটা গোলাবাড়ি মিঃ চার্লস ম্যাকার্থিকে ভাড়া দিয়েছেন। এই ম্যাকার্থিও অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন। অস্ট্রেলিয়াতে থাকতেই ওঁদের পরিচয় হয়। আর সেইজন্যেই ওঁরা পরস্পরের কাছাকাছি থাকতেন। দুজনের মধ্যে টার্নারের অবস্থাই ভাল। ম্যাকার্থি যদিও টার্নারের ভাড়াটে তবুও ওঁরা বেশ সহজভাবেই মেলামেশা করতেন। ওঁদের দু'জনকে প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যেত। ম্যাকার্থির একটি ছেলে। তার বয়েস হবে বছর-আঠারো। টার্নারের আবার একটি মেয়ে। তার

বয়েসও সতেরো-আঠারো হবে। দু'জনেরই স্ত্রী মারা গেছেন। টার্নার বা ম্যাকার্থি কেউই প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেশামেশি করতেন না। তবে ম্যাকার্থি প্রায়ই তাঁর ছেলেকে নিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে বা অন্য খেলাধুলোর আসরে যেতেন। ম্যাকার্থিদের কাজের লোক বলতে একটি চাকর আর একটি ঝি। টার্নারের লোকজন অনেক—প্রায় জনাছয়েক। টার্নার আর ম্যাকার্থির ঘর-সংসার সম্বন্ধে আমি এইটুকুই যা জানতে পেরেছি। এবার আসল ঘটনার কথা বলি।

"জুন মাসের তেসরা, মানে গত সোমবার, বেলা তিনটে নাগাদ ম্যাকার্থি তাঁর হেদারলির বাড়ি থেকে বস্কোম্ব ভ্যালির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বস্কোম্ব উপত্যকা দিয়ে যে নদীটি বয়ে গেছে তারই জলে ঝিলটির উৎপত্তি। ম্যাকার্থি সকালবেলায় তাঁর চাকরকে নিয়ে রস-এ গিয়েছিলেন। বলেছিলেন সকাল-সকাল বাড়ি ফিরতে হবে। তিনটের সময় তাঁর একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেই দেখা করতে যাওয়াই তাঁর শেষ যাওয়া। সেখান থেকে তিনি জীবিত অবস্থায় আর ফিরে আসেননি।

"হেদারলির বাড়ি থেকে বস্কোম্ব ঝিল খুব বেশি হলে সিকি মাইল। দুজন লোক তাকে ওই পথে হেঁটে যেতে দেখেছে। এদের একজন এক বুড়ি। তার পরিচয় জানি না। আর একজন উইলিয়ম ক্রোডার। ক্রোডার টার্নারের পোষা জন্তু-জানোয়ারের দেখাশোনা করে। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এরা দু'জনেই বলেছে যে, ম্যাকার্থি একলাই মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ ছাড়া ক্রোডার বলেছে যে, ম্যাকার্থি যাবার একটু পরেই তাঁর ছেলে জেমস ওই দিকে গেছে। জেমসের হাতে বন্দুক ছিল। ক্রোডার ভেবেছিল যে, জেমস তার বাবার সঙ্গে যাচ্ছে। তাই সমস্ত ঘটনাটা না জানা অবধি এ-ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামায়নি। ক্রোডার ছাড়া অন্য লোকেও ম্যাকার্থিদের দেখেছিল। বস্কোম্ব ঝিলের চারদিকে প্রচুর গাছপালা। তবে ঝিলের ধারে ঘাস আর নলখাগড়ার ঝোপ আছে। বস্কোম্ব ভ্যালি এস্টেটের দেখাশোনা করবার ভার যে লোকটির ওপর, তার বছর চোদ্দ বয়েসের মেয়ে পেসেন্স মোরান ওদের দেখতে পায়। পেসেন্স ওই ঝিলের ধারে ফুল তুলতে গিয়েছিল। সে বলেছে, যখন সে ঝিলের কাছাকাছি আসে তখন দ্যাখে যে জেমস আর তার বাবা নিজেদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া করছে। তারা এত জোরে চিৎকার করছিল যে, পেসেন্সের মনে হয় এখনি হয়তো ওরা হাতাহাতি শুরু করবে। জেমস তো একবার এমন ঘুষি পাকাল যে, পেসেন্সের মনে হল সে হয়তো তার বাবাকে মেরেই বসবে। ভয়ে সে দৌড়ে সেখান থেকে বাড়ি চলে আসে আর তার মাকে এই সব কথা বলে। পেসেন্সের কথা শেষ হবার আগেই জেমস ছুটতে ছুটতে তাদের বাড়ি এসে তার বাবার কথা বলে। সে বলে তার বাবাকে সে মৃত অবস্থায় হ্রদের ধারে দেখতে পেয়েছে। পেসেন্সের বাবার সাহায্য তার খুব দরকার। জেমস যখন পেসেন্সদের বাড়িতে আসে তখন না ছিল তার বন্দুক, না ছিল তার টুপি। তার ডান হাতে আর জামার হাতায় রক্তের দাগ লেগে ছিল। জেমসের সঙ্গে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান যে, তার বাবার দেহ হ্রদের ধারে ঘাসের ওপর পড়ে আছে। কোনও ভারী কিছু দিয়ে বারবার আঘাত করে তাঁর মাথাটা একদম থেঁতলে

দেওয়া হয়েছে। আঘাতের রকম দেখে মনে হয় যে, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারা হয়ে থাকতে পারে। বন্দুকটা মৃতদেহের কাছেই পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই সব দেখেশুনে পুলিশ জেমস ম্যাকার্থিকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার করোনারের আদালতে তার বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগ আনা হয়। আর তার পরের দিন বুধবার রসের জেলাশাসক জেমসের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করার আদেশ দেন। পুলিশ আর করোনারের কাছ থেকে ম্যাকার্থির খুনের সম্বন্ধে এইটুকু তথ্যই পাওয়া গেছে।"

আমি বললুম, "এ তো সাংঘাতিক ফ্যাসাদ দেখছি। চারপাশের ঘটনা, মানে যাকে আইনের ভাষায় সারকাম্‌স্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বলে, দেখে মনে হচ্ছে যে হত্যাকারীরা কে তা বোঝা শক্ত নয়।"

"দ্যাখো এই সারকাম্‌স্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স বা চারপাশের সাক্ষ্যপ্রমাণ খুবই মজার জিনিস। ওপর-ওপর দেখলে মনে হয় যে, ব্যাপারটা এইরকমই হয়ে থাকবে। কিন্তু যদি একটু অন্যভাবে দ্যাখো তো সব ব্যাপারটাই উলটে যাবে। এটা ঠিকই যে, ব্যাপার দেখে মনে হয় যে ওই ছেলেটিই খুনি। ও যে খুন করেনি সে-কথাটাও জোর করে বলা যাচ্ছে না। তবে ওই জায়গার অনেকেই মনে করছেন যে, ওর কোনও দোষ নেই। মিঃ টার্নারের মেয়ে মিস টার্নারও এই দলে আছেন। আর এই ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করবার জন্যে তিনি লেস্ট্রেডকে লাগিয়েছেন। লেস্ট্রেড এই কাজে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ও আমার সাহায্য চেয়েছে। আর সেইজন্যে আমরা দুই মাঝবয়সী ভদ্রলোক আরাম করে কোথায় ব্রেকফাস্ট খাব তা না, ঊর্ধ্বশ্বাসে পশ্চিম দিকে ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল স্পিডে ছুটছি।"

"কিন্তু দ্যাখো হোমস, আমার মনে হচ্ছে যে, এই তদন্তে তুমি বোধহয় খুব সুবিধে করতে পারবে না। সমস্ত ব্যাপারটাই এত স্পষ্ট..."

আমাকে শেষ করতে না দিয়ে হোমস হেসে বললে, 'দ্যাখো এই খুব স্পষ্ট ব্যাপারগুলোই বড় গোলমেলে। তা ছাড়া আমরা এমন কোনও কিছু আবিষ্কার করতেও পারি যা লেস্ট্রেডের চোখ এড়িয়ে গেছে। তুমি তো ওয়াটসন আমাকে জানো। আমি অহঙ্কার করি না। তবু আমি তোমাকে বলছি যে, আমি অবশ্য এমন কোনও সূত্র পাব যার খোঁজ লেস্ট্রেড পায়নি বা সারাজীবনে পাবে না। আর সেই সূত্র থেকে এই কেসের ফয়সালা হবে। জেমস নির্দোষ কি না তা প্রমাণ হয়ে যাবে। তোমাকে একটা ছোট্ট প্রমাণ দিই। তোমার শোবার ঘরের জানলাটা ঘরের ডান দিকে। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, এই সোজা জিনিসটা লেস্ট্রেডের চোখে পড়বে না।"

"কিন্তু সে কথা তুমি কীভাবে জানলে?"

"তোমাকে তো আমি অনেক দিন ধরে জানি। তুমি মিলিটারিতে ছিলে। তুমি সব ব্যাপারেই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমি জানি তুমি সকালে দাড়ি কামাও। আর এই সময়ে নিশ্চয়ই আলো জ্বেলে দাড়ি কামাবে না, সূর্যের আলোতেই কামাবে। অথচ দেখছি যে, তোমার ডান গালের দাড়ি যত নিখুঁতভাবে কামানো হয়েছে বাঁ গালটা তত নিখুঁত হয়নি। গালের তলায়, চিবুকের নীচে সব জায়গায় কামানো হয়নি। এখন আলোটা যদি চারদিকে সমানভাবে পড়ত তা হলে তুমি নিশ্চয়ই এরকম ভাবে কামাতে না। এটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু এই হচ্ছে আমার কৌশল। আর এই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে আমার এই ধরনের কৌশল কাজেও লেগে যেতে পারে। এ ছাড়া আরও দু-একটা ছোটখাটো পয়েন্ট আছে। সেগুলো একটু খতিয়ে দেখা দরকার।"

"সেগুলো কী?"

"যেমন ধরো, ওকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়নি। ওকে হেদারলির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় ঘটনার অনেক পরে। পুলিশ ইনসপেকটর তাকে যখন গ্রেফতার করে সে নাকি বলেছিল যে, এ-কথা শুনে সে মোটেই আশ্চর্য হয়নি। এই নাকি তার পাওনা ছিল। করোনারের কোর্টে এ-কথা শুনে জুরিদের মনে ওর দোষ সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ ছিল সেটাও দূর হয়ে যায়।"

"ও তো নিজের মুখে দোষ কবুল করেছে দেখছি।"

"না। এ-কথা বলার পরে ও বলে যে, এ ব্যাপারে ও সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

"কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছে তারপর এসব কথা শুনলে মনের সন্দেহটা আরও জোরদার হয়।"

হোমস বললে, "না, ঠিক উলটোটা। চারদিকের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমি ওইটুকুই যা আলোর চিকচিকিনি দেখতে পাচ্ছি। ও যত নির্দোষই হোক না কেন, ও নিশ্চয়ই এত আহাম্মক নয় যে, ও কী বিপদের মধ্যে পড়েছে সেটা বুঝবে না। পুলিশ যখন গ্রেফতার করতে আসে তখন যদি ও এমন ভাব করত যে, ও একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেছে বা ও খুব রাগারাগি করত তা হলেই সেটা সন্দেহের ব্যাপার হত। কেননা এই অবস্থায় তার অবাক হওয়া বা রাগ করা দুটোই অস্বাভাবিক হত, অথচ ও যদি সত্যি-সত্যিই ধূর্ত হত তা হলে ও ঠিক ওইরকমই কিছু একটা করত। ও যে সবকিছু এত সহজভাবে নিয়েছে তার থেকেই মনে হচ্ছে যে, হয় ও সত্যি-সত্যি নির্দোষ, নয়তো ও খুব দৃঢ় আর সংযত চরিত্রের লোক। আর এটা পাওনা বলাটাও ওর পক্ষে ঠিকই হয়েছে। একবার অবস্থাটা মনে মনে ভাবো। ও ওর বাবার মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিনই বাবার সঙ্গে কোনও বিষয়ে কথাকাটাকাটি হতে হতে ও এতই রেগে গিয়েছিল যে, সেই ছোট মেয়েটির কথা থেকে আমরা জানতে পেরেছি, সে এমন ভাব করেছিল যেন হাতাহাতি করতে যাচ্ছে। ওর কথার মধ্যে যে অনুশোচনা আর দুঃখের ভাব রয়েছে, তার থেকে আমার মনে হচ্ছে যে, ও খুনি নয়—সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

আমি বললুম, "আমার মনে হচ্ছে না। এর চাইতে ঢের তুচ্ছ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে আইনের বিচারে অনেকের ফাঁসি হয়েছে।"

"ঠিকই। তবে অনেক লোককে অন্যায় ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তা তো স্বীকার করবে।"

"তা ও নিজে এ সম্বন্ধে কী বলছে?"

"ও যে-কথা বলছে সেটা অবশ্য উৎসাহজনক কিছু নয়। তবে ও যা বলছে তার মধ্যে ভাববার মতো দু-একটা জিনিস আছে। এই কাগজগুলো পড়লেই তুমি তা জানতে পারবে।"

(ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মামার কুকুর

শৈলেনকুমার দত্ত

বিদেশ থেকে গদাইমামা
আনল কুকুর জমকালো,
ধূসর গায়ে সাদার ডোরা,
কানের দু'পাশ কম কালো,
গতর দেখে বাড়ির লোকের
সত্যি পিলে চমকাল !
খায় না কুকুর মাংস ছাড়া,
সাবান মেখে চান করে,
দুপুরবেলা দু' চোখ বুজে
কেবল ঘুমের ভান করে,
সেই গরবে গদাইমামা
গুনগুনিয়ে গান করে ।
কাণ্ড হল সেদিন রাতে
যেই না মামার নাক ডাকে,
অমনি কুকুর চেঁচিয়ে বাড়ি
মাথায় করে হাঁকডাকে
মামাও তাকে ঠাণ্ডা করার
নানান রকম ডাক ডাকে ।
মামার কুকুর সেদিন থেকে
এমনি হল শান্ত না !
মানুষ তো ছার, বেড়ালছানাও
মোটেই তাকে মানত না ।
তার শোকেতে সবাই কাতর,
এটাই মামার সান্ত্বনা !

ছবি : দেবাশিস দেব

ভূতের গল্প

সুভাষপ্রসন্ন ঘোষ

"মাঝরাত্তির হলে
নিমগাছে ভূত দোলে,
বাড়ির পাশেই আছে গাছটা ।
দেখেছি ভূতের চোখ,
বাপ রে কী ভয়ানক !
ঝুলে থাকে ভূত চার-পাঁচটা ।"

"তাই নাকি, তাই নাকি ?
আচ্ছা দাদাকে ডাকি,
দাদা নিজে শুনে যাক্ গল্প ।
দাদার মেজাজটা তো
ভারী কড়া জানো না তো
কিল ঘুসি খেতে পারো অল্প ।"

"ভূতকে দেখিনি ভাই ।
কিন্তু শুনতে পাই
মামদো পেত্নি বেম্‌দত্যি
কথা বলে সারারাত,
ভয়ে আমি কুপোকাত,
ঘটনাটা একেবারে সত্যি ।"

"কেন ভাই মিছিমিছি—
মিথ্যে বলছ, ছি, ছি,
যদি আমি ডেকে আনি মামাকে,—
টেরটি তখন পাবে ।
ভাল করে বুঝে যাবে,
মিথ্যে বলার সাজা আমাকে ।"

"বাব্বা হয়েছে ঢের,
মিথ্যে বলেছি ফের ।
তবুও একটা কথা জানবে,
সন্দেহ নেই তাতে,
ভূতেরা বেরোয় রাতে,
আমার এ-কথাটা তো মানবে !"

চিকিচ্ছে

শেখর আহ্‌মেদ

কান্তবাবু
হলেন কাবু
কয়েক ডাবু
দুগ্ধ-সাবু
আহার করে রাত্রে,
জ্বরের তাপে
শরীর কাঁপে
পেটের চাপে
বুকের হাঁপে
বেদন হল গাত্রে ।
বদ্যি এসে
বলেন কেসে,
এই বয়েসে
যাবেন টেঁসে
নয় সেটা আশ্চয্যি,
কিন্তু যাতে
আজকে রাতে
ফি ফসকাতে
না হয়, হাতে
দিন, চিকিচ্ছে করচি ।

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

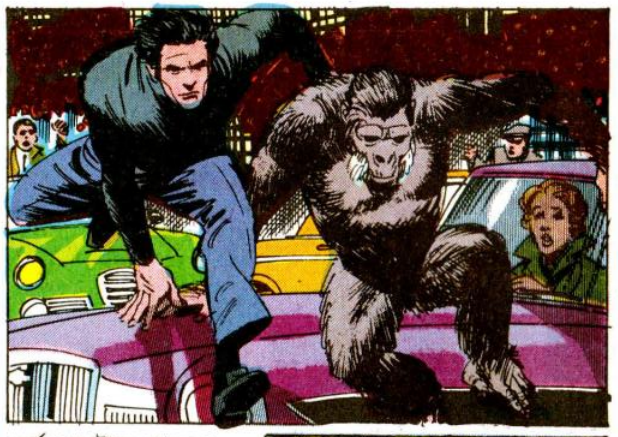

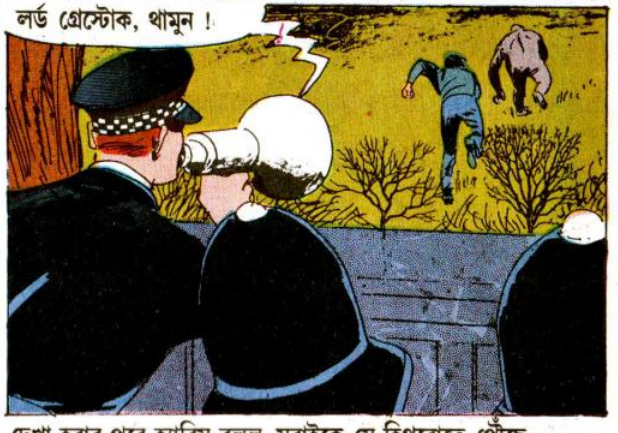

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ছদ্মবেশী দোকানদার

তুলসী সেনগুপ্ত

লটারির টাকা পেয়ে অমিতজ্যোতি আধুনিক প্যাটার্নের স্টুডিও খুললেন শ্যামবাজারের মোড়ে। দিনকাল পালটেছে। সাজানো-গোছানো দোকান ছাড়া খদ্দের আসতেই চায় না। নাম দিলেন 'শুভ্র স্টুডিও'। আগের মতো অমিতজ্যোতিকে ক্যামেরা ঘাড়ে করে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে হয় না। দোকানে ফিল্ম আর ক্যামেরাও সাজিয়ে রেখেছেন অনেক। কেনাবেচা ভালই। কিন্তু মনে শান্তি নেই অমিতজ্যোতির। বাড়িতে আগের মতো হৈ-চৈ করেন না। সারাক্ষণ মুখভার করে থাকেন। শুভ্রর বাবা সৌরেনবাবু একদিন প্রশ্ন করলেন, "হ্যাঁ রে শুভ্র, অমুর কী হয়েছে বলতে পারিস?"

"না তো।"

এতে সৌরেনবাবু আরও ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, "তোর মা-ও কিছু বলতে পারল না। ভাবলাম তুই নিশ্চয়ই জানিস।"

বাবার দুর্ভাবনা দেখে বিচলিত না হয়ে পারল না শুভ্র। বলল, "পরীক্ষা হয়ে যাক, তখন বলতে পারব।"

সৌরেনবাবুর অগাধ বিশ্বাস শুভ্রর ওপর। তাই কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "সেদিন রজতকে বলতে শুনলাম ওর নাকি স্ট্যাটিক্স্ মাথায় ঢুকছে না। বলিস ও যেন আমার কাছে চলে আসে।"

শুভ্র সে-কথায় খুশি হয়ে বলল, "টেলিফোনে রজতকে একথা জানিয়ে দিই।"

সৌরেনবাবু মুচকি হাসলেন এবার। কারণ গত সপ্তাহেই বাড়িতে ফোন এসেছে। এখন কিছু হলেই ফোনের কথা বলে শুভ্র। বললেন, "নিশ্চয়ই বলবি।"

শুভ্র একটুও দেরি না করে ফোন করার জন্য বাবার পড়ার ঘরে চলে এল। রজতের বাড়ির ফোন নাম্বার ওর মুখস্থ। ও ঠিকমতো নাম্বার ডায়াল করে বুঝল ফোন এনগেজড্। সুতরাং মিনিট তিন-চার অপেক্ষা করেই ও ফের ডায়াল ঘোরাল। এবারও ওপাশ থেকে এনগেজড্ সাউণ্ড শুনতে পেল। লাইন না পাওয়ায় রাগ হলেও শুভ্রর বুঝতে বাকি থাকল না, পুলিশ কমিশনারের বাড়ির লাইন পাওয়া বেশ কষ্টকর। ওকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেই সৌরেনবাবু বললেন, "কী রে, কথা হল?"

"না। এনগেজড্ সাউণ্ড বেজেই চলেছে।"

এবারও মুচকি হাসলেন সৌরেনবাবু। বললেন, "আমিও দু-চারবার চেষ্টা করেছি। লাইন পাইনি। কমিশনারের বাড়ি

বলে কথা ! রজতের বাড়ি গিয়ে এক সময় বলে আসিস।"

নিজের ঘরে না ঢুকে শুভ্র ছোটকাকার ঘরে উঁকি মেরে দেখল, ছোটকাকা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরে পায়চারি করছেন। ফলে ঘরে না ঢুকে পারল না। অমিতজ্যোতি শুভ্রকে দেখেও কিছু বললেন না।

উদ্বিগ্ন হয়ে শুভ্র জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী হয়েছে ছোটকাকা ?"

অমিতজ্যোতি গম্ভীর মুখ করে বললেন, "টাকা যে কী সর্বনেশে জিনিস তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।"

শুভ্র ছোটকাকার আপাদমস্তক দেখেও কোনও প্রশ্নই করল না।

অমিতজ্যোতি বললেন, "তুইও খুব পালটে গেছিস। আগে হলে কারণ জিজ্ঞেস না করে পারতিস না।" শুভ্র উত্তর দিল, "একদিন তুমিই বলেছিলে, কারণ ছাড়া কার্য হয় না। সুতরাং তোমার মনখারাপের পেছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে।"

শুভ্রর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলেন অমিতজ্যোতি। বললেন, "তোর সব মনে থাকে দেখছি। আমার খুব কষ্টে দিন যাচ্ছে রে।"

"কিসের কষ্ট তোমার ?"

অমিতজ্যোতি গুছিয়ে বলতে থাকেন, "আগে কত স্বাধীন ছিলাম, এখন স্বাধীনতা নেই, সুখ নেই, আগে যেখানে যখন খুশি ক্যামেরা সঙ্গে করে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। তুলতে পারতাম কত রকমের ছবি ! প্রকৃতির অপূর্ব বর্ণ-বৈচিত্র্য সবই ক্যামেরায় ধরে রাখতে পারতাম। এখন সেদিন আর নেই। সেই সকালে দোকান খুলে বসি, ফিরি রাতে। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক শুধু খাওয়ার আর শোওয়ার। ধুত্, একে কি জীবন বলে ! এখন শুধু টাকা গুনি। কত লাভ হল, এ-নিয়েই ব্যস্ত থাকি। আমার যে কী কষ্ট তা তোকে আর কীভাবে বোঝাব।"

শুভ্র এবার সত্যিই অবাক না হয়ে পারল না ছোটকাকার কথায়।

অমিতজ্যোতি খোলা জানলার দিকে চোখ রেখে বললেন, "ওই দ্যাখ, কত পাখি উড়ছে নীল আকাশের নীচে ; কত সুন্দর আর স্বাধীন ওদের জীবন। ভেবে দ্যাখ, যেদিন প্রথম দাদা আমাকে ইয়াশিকা ক্যামেরা উপহার দিয়েছিলেন, সেদিন আমার কী সুখ আর আনন্দই না হয়েছিল। এখন আমি পারি অনেক অনেক দামি ক্যামেরা আর ফিল্ম কিনতে, কিন্তু মাঝখান থেকে সত্যিকারের সুখ জীবন থেকে উধাও হয়ে গেল।" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অমিতজ্যোতি।

শুভ্র এবার প্রশ্ন করল, "চিরকাল কি মানুষ একরকম থাকে ছোটকাকা ?"

"থাকে না জানি। কিন্তু এর ওপরেও হয়েছে এক ঝামেলা।"

"কিসের ঝামেলা ?"

অমিতজ্যোতি বললেন, "শুনলে তুই হয়তো আমাকে পাগল ভাববি।"

"মোটেই না।"

অমিতজ্যোতি বললেন করুণ মুখ করে, "রাখালবাবুর ছেলেটাকে দেখে ভীষণ কষ্টে পড়েছি।"

"কোন রাখালবাবু ?"

"লক্ষ্মী জুয়েলারির রাখালবাবু।"

শুভ্র বলল, "ভবার কথা বলছ ? ও তো বদ্ধ পাগল।"

"অথচ, রাখালবাবু কত সজ্জন ছিলেন। পাড়ার বিপদে আপদে, পালা-পার্বণে কত কী করতেন। আর ওঁর ছেলেটাই কিনা হল পাগল। আহা ! কী কষ্ট বেচারির।"

শুভ্র জিজ্ঞেস করল, "ওর বাড়ির লোকরা ওকে সারাবার চেষ্টা করে না কেন ?"

অমিতজ্যোতি বললেন, "সকলেই এখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। বাড়ির লোকরা জানছে, ও নিজের মনে আছে থাক। ও তো আর ভাল হবার নয়। আমার কী মনে হয় জানিস, ভবার মধ্যে এখনও সুস্থতার লক্ষণ আছে। নইলে, সময়মতো দোকান খোলে বা বন্ধ করে কী করে ? একেবারে অসুস্থ হলে, ও কিছুতেই নিয়মমাফিক কাজ করতে পারত না।"

শুভ্র এবার প্রশ্ন করল, "দোকানে তো ছিটেফোঁটা জিনিসও নেই। শোকেস খালি। ঘরে ধুলোর পলেস্তরা পড়েছে। একজনকেও কোনওদিন ও দোকানে ঢুকতে দেখি না, অথচ রাখালবাবুর সময় দোকানটা কত জমজমাট ছিল।"

অমিতজ্যোতি উত্তর দিলেন, "তা হলেই বোঝ ভবার জন্য কষ্ট না হয়ে কি পারে ? রোজ আমাকে দেখলেই চা খাওয়ার জন্য পয়সা চায়। অথচ, ওরাই ছিল শিকদারবাগানের সবচেয়ে বনেদি ঘর। ভাবতে পারিস, এভাবে ও কতদিন বাঁচবে ?"

ভবা সম্পর্কে এ-সব শুনে ছোটকাকার ওপর শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গেল শুভ্রর। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে ধীরে ধীরে বলতে থাকে শুভ্র, "প্রথম সমস্যার সমাধান এক্ষুনি করে দিতে পারি, কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান আমার জানা নেই।"

অমিতজ্যোতি উৎসাহিত হয়ে বললেন, "প্রথম সমাধানটা কী শুনি ?"

শুভ্র উত্তর দিল, "দোকানে বিশ্বস্ত পরিশ্রমী কর্মচারী রাখলেই তো পারো। ওর ওপরে দোকানের ভার দিয়ে নিজে প্রাণের আনন্দে কাজ করতে পারো।"

অমিতজ্যোতি ওর কথা শুনে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ঠিক বলেছিস। এটা আমার মাথায় আসেনি। বিশ্বস্ত আর কর্মঠ লোকের চেষ্টায় থাকতে হবে," কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বললেন, "বড় হয়ে তুই ডাক্তারি পড়বি। ডাক্তার হয়ে ভবার মতো হতভাগ্যদের চিকিৎসা করে যদি সুস্থ আর স্বাভাবিক করে তুলতে পারিস তো বুঝবি জীবন সার্থক হল, ভেবে দ্যাখ, কত মায়া-মমতা ওই সব চিকিৎসকদের।"

শুভ্র সামান্য হেসে বলল, "ডাক্তার হয়ে বেরুতে তো অনেক দেরি আছে। তা ছাড়া বাবা-মা'র কী ইচ্ছে তা তো জানি না। তবে আমার খুবই ইচ্ছে বড় হয়ে ডাক্তার হই।"

অমিতজ্যোতি বললেন, "তোর আশা অপূর্ণ থাকবে না। আর সময় নষ্ট করিসনে। পড়তে বোসগে যা। রজতকে অনেকদিন দেখিনি। পারলে ওকে সঙ্গে করে একবার দোকানে যাস।"

শুভ্র কথা না বাড়িয়ে ধীর পায়ে অমিতজ্যোতির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত একটানা মন দিয়ে পড়ল শুভ্র। আড়মোড়া ভেঙে বড় করে হাই তুলে রজতের বাড়ি গেল। পুলিশ কমিশনারের বাড়ি। দিনরাত বাড়ির সামনে পুলিশ পাহারা থাকে। রাইফেলধারী পুলিশরা শুভ্রকে চেনে। চোখাচোখি হলে সামান্য হাসে। শুভ্রও হেসে অবলীলায় বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

রজত স্ট্যাটিক্স নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল। শুভ্রকে দেখে ভরসা পেল।

শুভ্র বলল, "তোদের এত কে ফোন করে রে?"

রজত বলল, "সে আমি কী করে জানব। পুলিশের ব্যাপার। সময় নেই অসময় নেই ফোন বেজেই চলেছে।"

"তার মানে?"

রজত বুঝিয়ে বলল, "অফিস আওয়ার্সে ফোন আসেই না বলতে গেলে। সকালে আর রাতে খুব বেশি ফোন আসে। বাবার চাকরিটা বড় বিচ্ছিরি। তোর বাবার মতো আমার বাবাও যদি কলেজে পড়াতেন তো খুব ভাল হত।"

শুভ্র উত্তর দিল, "পুলিশ কমিশনার কি যে-সে হতে পারে? কত দায়-দায়িত্ব। কাকাবাবুকে কতদিন দেখি না। অবশ্য প্রায়ই কাকাবাবুর কথা খবরের কাগজে পড়ি।"

রজত বিষণ্ণ গলা করে বলল, "যা দেখিস তার অধিকাংশই নিন্দা। আমার খুব খারাপ লাগে। পুলিশের নিন্দায় সকলেই পঞ্চমুখ। যেহেতু বাবা পুলিশ কমিশনার সেজন্য সব দোষ বাবার ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়।"

শুভ্র প্রসঙ্গ পালটে বলল, "বাবা তোকে যেতে বলেছেন। তোর সেদিনকার কথা বাবা সব শুনে ফেলেছিলেন। তুই স্ট্যাটিক্স্ বুঝতে পারছিস না শুনে বাবারও খুব দুশ্চিন্তা। বাবাও তোর সঙ্গে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। লাইন পাননি। আজ বিকেলেই যাস।"

রজত অভিভূত হয়ে গেল সে কথায়। বলল, "নিশ্চয়ই যাব। এত বড় সুযোগ কি কেউ ছাড়ে।"

শুভ্র এবার ছোটকাকার কথাও একটানা বলে গেল রজতকে।

রজত বলল, "ছোটকাকা মানুষটা বড় অদ্ভুত। মানুষ যেখানে টাকা-টাকা করে হাপিত্যেশ করছে, সে সময় ছোটকাকা টাকার জ্বালায় অস্থির। লোকে কেউ বিশ্বাসই করবে না ছোটকাকার কথা। কিন্তু আমরা তো জানি, ছোটকাকার মধ্যে বিরাট এক শিল্পী মন রয়েছে।"

শুভ্র এর পর বলল, "ভবাদের মতো হতভাগ্যদের কথা ক'জন ভাবে বল? পাগল দেখলে মানুষ যেন মজা পায়। অথচ, ওদের কী কষ্ট তা ছোটকাকার বলার আগে পর্যন্ত আমাদের মাথাতেও আসেনি। কত পাগল তো আমরাও দেখেছি, কোনওদিন ভয় পেয়েছি, কোনওদিন আমরাও হেসেছি। বিশ্বাস কর, এখন আমার ওদের জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে। স্বাভাবিক মানুষের মতো ওরাও যদি বেঁচে থাকত, তা হলে কী সুন্দরই না হত।"

ঘড়িতে যখন ঢং-ঢং করে বারোটা বাজল সে সময় শুভ্র বলল, "আসি রে। যা বললাম তা যেন মনে থাকে।"

রজত মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

বাড়িতে ঢুকে জামা খুলতে গিয়েই টেবিলের ওপর ভাঁজ-করা একটা কাগজ দেখতে পেয়ে শুভ্র অবাক হয়ে গেল। কাগজটা খুলেই লেখকের নাম দেখে নিল প্রথমে। ছোটকাকা লিখেছেন, "সে সময় কথায় কথায় আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। পরীক্ষা হয়ে গেলে তোদের নিয়ে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাব। সমুদ্র, না পাহাড় সেটা তোরাই ঠিক করবি। তবে পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত এ-নিয়ে মাতামাতি চলবে না।"

কী যে এক সুখের জগতে নিয়ে গেল ছোটকাকার লেখা এই কটি কথা তা শুভ্র সম্ভবত কাউকেই বুঝিয়ে বলতে পারবে না। বিকেলে রজত এলে, ছোটকাকার এই চিঠি দেখিয়ে রজতকে অবাক করে দিতে পারবে ভেবে মনে মনে রোমাঞ্চ অনুভব করল শুভ্র।

॥ দুই ॥

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর, শুভ্র ভাবল, একটু শুয়ে নেবে। কিন্তু ভ্যাপসা গরমে শরীর আইঢাই করছিল। একফালি আকাশ চোখে পড়ল শুভ্রর। ঘোলাটে আকাশ। এ-রকম মেঘে বৃষ্টি হয় কি না জানে না ও। ছোটকাকা এ-বিষয়ে খুব এক্সপার্ট। কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়, কোন্ মেঘে হয় না, এ সবই ছোটকাকার নখদর্পণে। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চোখে ঘুম জড়িয়ে এল। ঘণ্টাখানেক রোজই শুয়ে নেয় ও। কিন্তু আজ ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল।

ওর মা অর্চনা দেবী ঘরে ঢুকে বললেন, "এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোলি? শরীর ভাল নেই নাকি?" শুভ্র বড় করে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল। বলল, "ইশ্, এতক্ষণ ঘুমিয়েছি, তুমি ডেকে দাওনি কেন? দুপুরটাই মাটি হল।"

অর্চনা দেবী বললেন, "দুবার ঘরে এসেছিলাম। এত ঘুমোচ্ছিস দেখে জাগাতে ইচ্ছে হল না।" রজতও এসে পড়ল এ-সময়। শুভ্রকে বিছানায় বসে থাকতে দেখে হেসে ফেলল রজত। বলল, "সারা দুপুর ঘুমিয়েছিস নাকি?"

শুভ্র মাকে বলল, "মা, আজ একটু চা দাও। ঘুমিয়ে শরীর ভার-ভার লাগছে।"

অর্চনা দেবী চলে যেতেই শুভ্র ছোটকাকার লেখা চিঠিটা রজতকে পড়তে দিল। রজত উত্তেজিত হয়ে বলল, "গ্রাণ্ড! লং লিভ ছোটকাকা।"

"চুপ, চুপ! ছোটকাকার চিঠির শেষ লাইনে কী লেখা আছে, ভুলে গেলি কেন?"

রজত একেবারেই চুপসে গেল সে কথায়।

শুভ্র বলল, "বাবা এসেছেন?"

"না।"

"ভালই হল," বলেই শুভ্র চাপা গলায় রজতকে বলল, "তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

রজত উত্তর দিল, "যা বলবি তাড়াতাড়ি বল। কাকাবাবু এসে গেলেই স্ট্যাটিকস্ ঘাড়ে চেপে বসবে।"

শুভ্র এবার ভবার প্রসঙ্গে সব কথা সবিস্তারে বলল,

নবরূপে প্রাচীন ঐতিহ্য

রাজকমল®

পলিয়েস্টার ও কটন প্রিন্টেড শাড়ি

ভারতের শাড়ি শিল্প প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের নারীজগতের বিস্ময় উৎপাদন করে আসছে। সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার রুচিশীল সমন্বয় এনে রাজকমল শাড়ির জগতে এক বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে।

চিত্রতারকা জয়া প্রদা
রাজকমল শাড়ির সাজে

International MARKETQUEEN

COTTON PRINTED SAREES

Rajkamal®

Making tradition come alive

International TALK OF THE TOWN®

POLYESTER SAREES

রাজকমল
সকল নারীর
নিজস্ব শাড়ি

"জানিস, ছোটকাকা ভবাকে নিয়ে বড় ঝামেলায় পড়েছেন।"

রজত উত্তর দিল, "ছোটকাকার মতো মানুষ আর একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

ঠিক এ-সময় সৌরেনবাবুর গলা শুনতে পেল ওরা। রজত আর দেরি না করে বই-খাতা নিয়ে সৌরেনবাবুর রিডিং-রুমে চলে গেল।

সৌরেনবাবু বললেন, "বোসো। আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি।"

রজত চুপচাপ বসে রইল। সারা ঘরে শুধু বইয়ের গন্ধ। রজত এর আগে কখনও এ-ঘরে ঢোকেনি। মিনিট-পনেরোর মধ্যেই সৌরেনবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, "যত প্রাকটিস করবে ততই দেখবে, এর চেয়ে সহজ সাবজেক্ট খুব কমই আছে। আসলে ইনটারেস্টটাই বড় জিনিস। যাই হোক, স্ট্যাটিকস্ কী-কী বুঝতে পারছ না আমাকে খুলে বলো।"

রজত একে একে সব দেখিয়ে দিতে লাগল।

সৌরেনবাবু অত্যন্ত সহজ উপায়ে সে সব রজতকে বুঝিয়ে দিয়ে নতুন একটা অঙ্ক সল্‌ভ করতে বললেন। সময় দিলেন দশ মিনিট।

রজত অঙ্কটায় চোখ বুলিয়েই প্রসেসটা বুঝে নিল এবং দশ মিনিটের মধ্যেই অঙ্কটা কষে খাতা এগিয়ে দিয়ে দুরু-দুরু বুকে চেয়ে রইল সৌরেনবাবুর দিকে।

সৌরেনবাবু এক ঝলক অঙ্কটা দেখেই বললেন, "ঠিক আছে। এই নিয়মের যে-কটা অঙ্ক আছে আজ রাত্তিরেই সব ক'টা কষে ফেলবে। আগামীকাল ঠিক এ সময় এসো।"

এত অল্প সময়ে জটিল অঙ্ক যা এতদিন মাথাতেই ঢুকছিল না রজতের, তা সহজে আয়ত্ত করে মনে মনে ভীষণ খুশি হল।

সৌরেনবাবু বললেন, "আজ এ-পর্যন্তই। কাল ফের অন্য জিনিস বুঝিয়ে দেব। মিছিমিছি এ-নিয়ে আর দুশ্চিন্তা কোরো না।"

রজত সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা উপরে উঠে এল শুভ্রর ঘরে। শুভ্র তখন ফিজিক্স পড়ছিল।

শুভ্র রজতের দিকে তাকিয়ে বলল, "এত খুশি-খুশি দেখাচ্ছে যে?"

রজত লজ্জিত হয়ে বলল, "এতদিন মিথ্যে ভয় পেয়েছি কাকুকে। আজ কত সহজে সব বুঝে গেলাম। আমার বিশ্বাস, আর কখনও এ-নিয়মের অঙ্ক ভুল হবে না।"

শুভ্র সময় দেখে বলল, "চল, আর নয়। এবার একটু ঘুরে আসি ছোটকাকার দোকান থেকে।"

ওরা চা জলখাবার খেয়ে ছোটকাকার দোকানের দিকে রওনা হল।

ওদের দেখে অমিতজ্যোতির খুশি ধরে না। বললেন, "এত দেরি করে এলি কেন?"

শুভ্র দেরির কারণ বলতেই অমিতজ্যোতি বললেন, "তা হলে ভালই হয়েছে। আমার চিঠি তো তোরা পেয়েছিস। আমি তোদের ওপর ভার দিয়েছিলাম। কিন্তু ঠিক করলাম, ওটা আমিই ঠিক করব।"

ওরা দুজনই একসঙ্গে বলে উঠল, "কী ঠিক হল ছোটকাকা?"

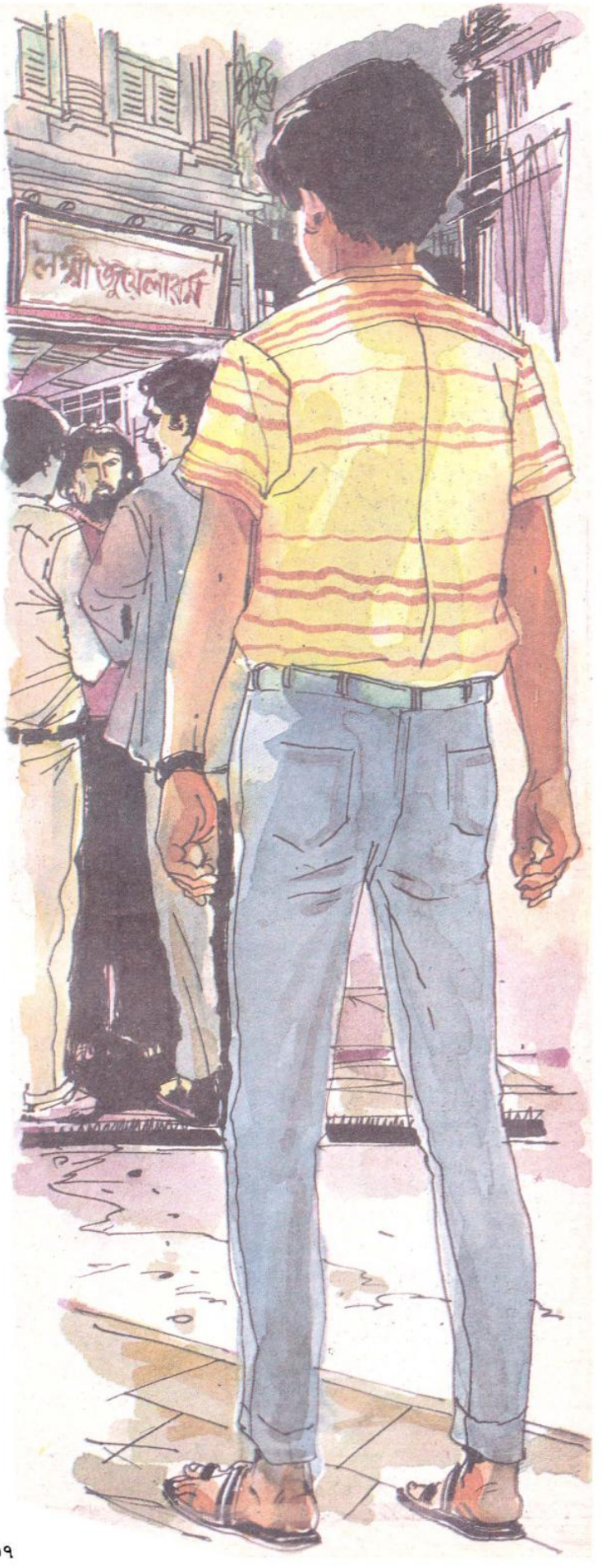

অমিতজ্যোতি উত্তর দিলেন, "দাদার কথা মনে পড়ে গেল। উনি বলেন, মানুষ অনেক অনেক টাকা খরচ করে হিল্লি-দিল্লি যায়। কিন্তু ঘরের কাছেই যে কত সুন্দর জিনিস রয়েছে, তা কেউ দেখতেই চায় না।"

শুভ্র বলল, "তা ঠিক। দূরের জিনিস দেখার জন্য মানুষ এত ব্যাকুল হয় কেন ছোটকাকা?"

অমিতজ্যোতি বললেন, "সেটা পরে বুঝবি। তবে সকলেই ভুল করে। ঘরের পাশেই থরে থরে সুন্দর জিনিস সাজানো আছে। সে সব প্রাণ ভরে দেখে তবে দূরের জিনিস দেখতে যাওয়া ভাল। আমি ঠিক করেছি, বিষ্ণুপুর যাব। আমাদের শিল্পীরা যে কত বড় ছিলেন তার চাক্ষুষ পরিচয় না ঘটলে কি চলে? পোড়ামাটির কাজ, শ্যামরায়ের মন্দির, রাসমঞ্চ, দলমাদল কামান সে সব না দেখে কেন মিছিমিছি হিল্লি-দিল্লি করব বল!"

রজত বলল, "দলমাদল কামানের সামনে কাজি নজরুলের একটা ছবি আমি দেখেছি। আমরা দু'জন ওই পোজে দলমাদল কামানের সামনে দাঁড়াব। ছবি তুলবেন আপনি।"

"বেশ তুলব। তার আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোদের পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ-নিয়ে মাতামাতি করতে পারবি না।"

ঠিক সেই সময় উজ্জ্বল চেহারার একজন দোকানে ঢুকতেই অমিতজ্যোতি বললেন, "কেমন হল ইন্টারভিউ?"

"ভাল, আশা করছি হয়ে যাবে।"

অমিতজ্যোতি জোর দিয়ে বললেন, "হবে না মানে! নিশ্চয়ই হবে। আমি যখন বলছি, তখন না হয়েই পারে না।"

ছেলেটি বলল, "বাকি একটা টাকা আপনাকে দিতে এলাম।"

অমিতজ্যোতি ধমকে বললেন, "শাট্ আপ। ও টাকা আমি নিতে পারব না ভাই। তোমার চাকরি হোক, তারপর একদিন এই পেটুক মানুষটাকে ভালমন্দ খাইয়ে দিও।"

ছেলেটি খুব সুন্দর ভঙ্গিতে হেসে বলল, "আপনাকে কোনওদিনই ভুলতে পারব না। এবার তা হলে আসি।"

"এসো ভাই।"

ছেলেটি চলে গেলে অমিতজ্যোতি ওদের দিকে তাকিয়েই বললেন, "এবার বাড়ি যা। আমার এখন অনেক কাজ। অনেকগুলো ফিল্ম ওয়াশ করতে হবে। আর এখানে দেরি করা মানেই আমাদের সকলেরই ক্ষতি।"

ওরা আর দাঁড়াল না। খুব খুশি হয়ে ওরা বাড়িমুখো হল। ফেরার পথে ওরা লক্ষ্মী জুয়েলারির সামনে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ভিড় দেখতে পেল। ওরা সকলেই হি-হি করে হাসছিল। ভবা মুখ বাঁকিয়ে গলায় বীভৎস সুর তুলে কী সব বলছে বুঝতে পারল না ওরা।

শুভ্র বলল, "কী হবে এসব দেখে?"

রজত বলল, "দাঁড়া না, আর একটু দেখি। ভবা ডান পা ওরকম করে আছে কেন রে?"

শুভ্র উত্তর দিল, "পোলিওতে ওর ডান পা-ও নষ্ট হয়ে গেছে। তবে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলতে পারে।"

রজতের খুব কষ্ট এ-কথা শুনে। এবার ওরা দেখল, ভবা ছোট একটা ইটের টুকরো নিয়ে ছেলেমেয়েগুলোর উদ্দেশে ঢিল ছোঁড়ার ভঙ্গি ক[illegible]রে আয়, ঢিল আমাদের গায়েও লাগতে পারে।"

শুভ্র ওকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলল, "ভয় নেই। ও কোনওদিনই ঢিল ছোঁড়ে না। একটু পরেই দেখবি, ও ওই হাতলভাঙা চেয়ারে চুপচাপ মাথা গুঁজে বসে থাকবে।"

রজত ছেলেমেয়েগুলোকে বলল, "যাও, সব বাড়ি যাও।" শুভ্রও ওদের ওই একই কথা বলল। ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে ভবার দোকানের সামনে থেকে সরে গেল। ভবা এবার শুভ্র আর রজতকে কাছে ডেকে বলল, "চার আনা পয়সা দাও না, চা খাব।"

শুভ্র আর রজত পরস্পরের মুখের দিকে চাইল।

শুভ্র বলল, "আজ পয়সা নেই। অন্য একদিন খাওয়াব।"

ভবা ধমকে বলে উঠল, "যা ভাগ।" ভীষণ রেগে গিয়ে কটমট করে তাকাল ভবা ওদের দিকে। ওরা কিন্তু ভয় পেল না একটুও।

রজত বলল, "মাত্র চার আনা পয়সা দিতে পারলে লোকটা কত খুশি হত।"

শুভ্র বলল, "আমরা পয়সা দেব কী করে ও তা বোঝেই না। যাকগে, একদিন ওকে চা খাইয়ে দিলেই চলবে।"

এখনও দিন তেমন বড় হয়নি। তাই খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকারে ছেয়ে যায় সব। তবু ভাল আজ লোডশেডিং নেই। সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওরা দোকানের সামনে থেকে দ্রুত সরে গেল।

রজত বলল, "মা খুব চিন্তা করছেন নিশ্চয়ই।"

শুভ্র বলল, "কাকিমা আমার মা'র মতন নন।"

রজত বলল, "তোর তো ডায়েরি লেখার অভ্যেস আছে। আজ যা-যা হয়েছে সবই তো ডায়েরিতে লিখবি। জানিস, আমিও তোর মতো ডায়েরি লেখা অভ্যেস করেছি।"

শুভ্র খুশি হয়ে বলল, "ভালই করেছিস। বাবা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই ডায়েরি লেখা ভাল। আজ যে ছোট সেই তো ভবিষ্যতে কেউকেটা হবে। তখন সকলেই তার ছেলেবেলার কথা জানতে চাইবে। অনেকেই বড় হয়ে ডায়েরি লেখে, কিন্তু স্মৃতি কি সব সময় ঠিক থাকে। অনেক ছোটখাটো ঘটনা মানুষ বড় হয়ে ভুলে যায়, ভুলে যাওয়া অনেক ঘটনাই তখন মূল্যবান হয়ে ধরা পড়ে।"

রজতের খুব ভাল লাগল এসব শুনতে। দেরি না করে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

॥ তিন ॥

শুভ্রদের পরীক্ষা গত সপ্তাহেই শেষ হয়েছে।

অর্চনা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, "ভালভাবে পাশ করতে পারবি তো?"

শুভ্র হেসে বলল, "রজতের মা-ও সেদিন তোমারই মতো প্রশ্ন করেছিলেন।"

অর্চনা দেবী বললেন, "কোন্ মা ছেলের ভাল চায় না বল? ভালভাবে পাশ না করতে পারলে...।"

মা'কে কথা শেষ করতে না দিয়ে শুভ্র বলল, "ভাল কলেজে ভর্তি হতে পারব না, তাই বলবে, তোরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দে। পাশ করে ডাক্তারি পড়বি। নামের পাশে শুভ্রপ্রকাশ রায়, এম বি বি এস, লেখা থাকবে।"

"আর রজত?"

"ও-ও তাই করবে। তবে কী জানো ওকে নিয়ে একটু চিন্তায় পড়েছি।"

"কেন ? কী হয়েছে ওর ?"

শুভ্র বলল, "আসলে ও ওর বাবাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তায় থাকে। দেশজুড়ে কী রকম খুনোখুনি, রাহাজানি, ডাকাতি বেড়ে গেছে। আর পত্রপত্রিকায় সমালোচনার ঝড় বইছে।"

অর্চনা দেবী বললেন, "বিপদ-আপদ জেনে কি কেউ পুলিশে চাকরি করবে না ? এই তো সেদিন তোর বাবা বলছিলেন, বুদ্ধিমান আর সাহসী লোক যত পুলিশে কাজ করবে ততই দেশের মঙ্গল।"

ওদের কথা শুনতে পেয়েছিলেন সৌরেনবাবু। উনি সহাস্য মুখে ঘরে ঢুকে বেশ গুরুগম্ভীর গলায় বলতে থাকলেন, "বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"

এর পরের লাইনগুলো শুভ্রর জানা। ও সুন্দর ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে গেল কবিতার বাকি অংশ।

সৌরেনবাবু সস্নেহে শুভ্রর পিঠে হাত রেখে বললেন, "বিষ্ণুপুর যাওয়াই ঠিক হল তা হলে ?"

"ছোটকাকা তো সেদিন তাই বলেছেন। আমরা নাকি বিষ্ণুপুরই শুধু নয়, জয়রামবাটী, কামারপুকুরও ঘুরে আসতে পারব," শুভ্র উত্তর দিল।

সৌরেনবাবু বললেন, "সেই ভাল। খুব সুন্দর জায়গা বেছেছে অমু। কামারপুকুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান, পাঠশালা, হালদারপুকুর, লাহাদের বাড়ি—এ সবই দেখতে পাবি। জয়রামবাটীর মায়ের মন্দির দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে তোদের।"

অর্চনা দেবী বললেন, "তুমি আবার কবে গেলে ওখানে ?"

শুভ্র চট করে বলল, "গত বছর অধ্যাপকদের কী এক মিটিং হয়েছিল না বিষ্ণুপুরে। বাবা গিয়েছিলেন। এর মধ্যেই ভুলে গেলে ?"

সৌরেনবাবু বললেন, "সংসার-সংসার করে তোর মা'র কিছুই মনে থাকে না। তোরা ঘুরে আয়।" এবার অর্চনা দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওরা ঘুরে আসুক, তারপর গ্রীষ্মের ছুটিতে তোমাকে নিয়ে ওখান থেকে ঘুরে আসব। ওখানে আমার বন্ধু রামানন্দ কলেজের ইকনমিক্সের হেড। ওর বাড়িও ওখানেই। কোনও কষ্টই হবে না!" এবার শুভ্রর দিকে চেয়ে বললেন, "যাওয়ার আগে আমার কাছ থেকে বাদলের ঠিকানা নিয়ে যাস। বাইরে চেনাজানা লোক থাকলে খুব সুবিধে হয়।"

দুম করে অর্চনা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, "রজতের নাকি অঙ্ক পরীক্ষা ভাল হয়নি ?"

সৌরেনবাবু বললেন, "কে বললে ? ও তো অল্পের জন্য লেটার মার্কস্ পাবে না। আমি গতকালই ওর বাড়ি গিয়ে সব ক'টা অঙ্ক কষিয়ে দেখেছি। সহজ অঙ্কটাই ভুল করল রজত, না হলে লেটার মার্কস্ পেতই।"

এ-কথা শুনে শুভ্রর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলল না। রজত ঠিক এই সময় এল। সকলকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে কেমন অবাক হয়ে গেল। সৌরেনবাবু শুভ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যে কাজে এসেছিলাম সেটাই ভুলে গেছি। কয়েকটা হাসির লেখা লিখতে হবে। লিখতে বসে দেখি, কাগজ ফুরিয়ে গেছে। শিগগির কাগজ কিনে নিয়ে আয় তো ! রজত বরং থাক, তুই যা।" কাগজ কেনার টাকা দিলেন শুভ্রকে সৌরেনবাবু।

শুভ্র বেরিয়ে গেল। এই ক'দিন আগেও সূর্যের তেজ এত ছিল না। শুভ্র একটু তাড়াতাড়িই দোকানের দিকে যাচ্ছিল। যেতে গিয়েই লক্ষ্মী জুয়েলারির সামনে ভবাকে দেখতে পেল। মন্দিরের সামনে হাতজোড় করে লোকে যেমন ঠাকুরপ্রণাম করে ভবাও ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করছে। ভবা সম্পর্কে ছোটকাকার কথা মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল শুভ্রর। ও আর সময় নষ্ট না করে কাগজ কিনে ফিরে আসতে গিয়েই দেখে ভবা হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসে কল্পিত কোনও একজনকে 'চোপ্, চোপ্' বলে ধমকাচ্ছে। ওর সামনে কেউই ছিল না সে সময়। পথচারীরাও যে যার কাজে ব্যস্ত। কেউই ভ্রূক্ষেপ করছে না ভবাকে। একটু আগের মানুষটার সঙ্গে এখনকার মানুষটার আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষ করে শুভ্র বেশ অস্বস্তি বোধ করল।

বাড়িতে এসে বাবার পড়ার টেবিলে কাগজ রেখে শুভ্র দ্রুত উপরে উঠে গেল নিজের ঘরে। রজত খেলার কাগজ পড়ছিল মন দিয়ে। পত্রিকায় 'বিস্ময় বালক' বলে উল্লেখ করেছে আজহারউদ্দিনকে।

শুভ্রর পায়ের শব্দে রজত ফিরে তাকিয়ে বলল, "যত্ত ঝামেলা সব আমাকেই বইতে হবে।"

"ঝামেলার কী হল ?"

রজত উত্তর দিল, "আজ পিসি মাদ্রাজ থেকে ফিরছেন করমণ্ডল এক্সপ্রেসে। দশটা পঁয়তাল্লিশে এসে পৌঁছবেন। রেটিনা ডিটাচমেন্ট হয়েছিল। ডঃ বদ্রীনাথের চিকিৎসায় ভাল হয়ে গেছেন। বাবার কাজ, মা'র শরীর খারাপ সুতরাং স্টেশনে আমাকেই যেতে হবে।"

শুভ্র বলল, "স্টেশনে যেতে আমার খুব ভাল লাগে। কত লোক আসছে যাচ্ছে ; ট্রেনের হুইসেল্ যখন বাজে তখন আমারও না অনেক অনেক দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করে। ধীরে ধীরে ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বাইরে চলে যায় তখন কত লোকের কত রকমের ভঙ্গি। কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ বা হাত তুলে নাচাতে থাকে।"

রজত গম্ভীর মুখ করে বলল, "তা ঠিক। কিন্তু ট্রেন যে ঠিক সময়মতো আসবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই। পিসিমার চিঠিতেই জেনেছিলাম, মাদ্রাজে পৌঁছতে ট্রেন পাঁচ ঘণ্টা লেট ছিল। এবার হয়তো দেখব ট্রেন দশ ঘণ্টা লেট।"

শুভ্র এবার না হেসে পারল না। বলল, "সে তো এনকোয়ারিতে গিয়ে খোঁজ নিলেই জানতে পারবি। তুই

মিছিমিছি ভাবছিস। দেখবি, এবার ঠিক সময়মতো ট্রেন আসবে।"

রজত বলল, "তুই আমার সঙ্গে চল্ না।"

শুভ্র উত্তর দিল, "কী করে যাই বল। মা আজ তোদের বাড়ি যাবেন বলেছেন।"

রজত খুশি-খুশি গলা করে বলল, "কতদিন পর কাকিমা আমাদের বাড়ি যাচ্ছেন। আমার কী, দুজন সাদা পোশাকের পুলিশ থাকবে আমার সঙ্গে, ওরাই দৌড়ঝাঁপ করবে, মালপত্র তুলবে। রাজার মতো চলে আসব।"

শুভ্র বলল, "তোর সঙ্গে পুলিশ থাকবে কেন?"

"বাবার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আছে তো, তাই! দিনকাল ভাল না···।"

কথার খেই ধরে অমিতজ্যোতি বললেন, "ঠিক বলেছে রজত। দিনকাল খুব খারাপ। এই তো দোকানে বেরুব, গিয়ে কী দেখব জানিস?"

"কী দেখবেন ছোটকাকা?" রজত জিজ্ঞেস করল। শুভ্র উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইল। অমিতজ্যোতি দুঃখী মুখ করে বললেন, "আসলে খু্ব বেশি কারা ছবি তুলতে আসে জানিস? জানিস না। বেকার ছেলেরা চাকরির জন্য পাসপোর্ট ছবি তুলতে আসে; ফেল-করা ছেলেরাও আসে দলে দলে। ওদের কাছ থেকে পয়সা নিতে খুব কষ্ট হয়। সেদিন তোরা চলে যাবার পর একজন চার টাকার খুচরো এনেছিল। এত খুচরো এ বাজারে কী করে পেল জিজ্ঞেস করতেই ছেলেটি বলল, রোজ মেটে ঘটে দশ পয়সা করে জমাত, ঘট ভেঙে এই পয়সা জোগাড় হয়েছে। আর সেদিন তো দেখলি, এক টাকা কম দিয়েছিল বলে টাকা ফেরত দিতে এসেছিল। ধুত্ছাই, দোকান তুলেই দেব। এত খারাপ দিনকাল যে কী বলব।"

শুভ্র ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ছোটকাকা, উনি যদি টাকা শোধ না দিতে আসতেন, তা হলে কি তোমার মনখারাপ হত?"

অমিতজ্যোতি বললেন, "রক্তমাংসের মানুষ যখন, তখন মনখারাপ হত বইকী। তবে কী জানিস, দাদার মতো আমিও চাই সকলের ভাল হোক। আজ খুব দেরি হয়ে গেছে রে, চলি। দু-একদিনের মধ্যেই বিষ্ণুপুরের ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলব।" কথা শেষ করেই অমিতজ্যোতি চলে গেলেন।

শুভ্র রজতকে প্রশ্ন করল, "তোর কথা কিন্তু শেষ করিসনি।"

রজত বলল, "দিনকাল খারাপ, গার্ড নিয়ে যাওয়ার কথা বাবাই বলেছেন।"

শুভ্র বলল, "ফ্রি ম্যান হয়ে জীবন কাটানোর যে কী আনন্দ, তা তোকে কী করে বোঝাব।"

"যাক্ গে, আগে সব সেরে আয়, তারপর তোকে একটা সারপ্রাইজ দেব।"

ঘড়ির কাঁটায় চোখ যেতেই রজত বলল, "আরেব্বাস, পৌনে দশটা বাজে। বাড়িতে আমি নেই দেখে কী কাণ্ডই না হচ্ছে।" কথা না বাড়িয়ে ঋজু পায়ে বেরিয়ে গেল রজত ঘর থেকে।

॥ চার ॥

টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল, তার ওপর লোডশেডিং। অমিতজ্যোতির ক'দিন ধরে জ্বর। দিন চার-পাঁচ কেটে গেল। রেমিশানের নাম নেই।

ছোটকাকার জন্য বার্লি আর ওষুধ কিনতে গিয়েছিল। জ্বরে না পড়লে ওরা এখন হৈ-হৈ করে বিষ্ণুপুরে কাটাতে পারত। ছোটকাকার ওপর, জ্বরের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল শুভ্রর। আবার দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল। আজ সকালে রক্ত নিয়ে গেছে ল্যাবরেটরির লোক। সন্ধে ছ'টায় বাবা রিপোর্ট নিয়ে আসবেন। ডাক্তারবাবু সন্দেহ করছেন টাইফয়েড। ও রোগ হলে আর কথা নেই, মাস দুয়েকের ধাক্কা। শুভ্র জানে, আগেকার মতো টাইফয়েড এখন আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। রক্তে টাইফয়েডের জীবাণু ধরা পড়লেই, ঠিকমতো ওষুধ দিলেই রোগ নিরাময়। এ-সব ভাবতে ভাবতে ও যখন লক্ষ্মী জুয়েলারির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে সময় ও অবাক হয়ে গেল ভবার সঙ্গে দুজন সুন্দর পোশাক-পরা লোককে কথা বলতে দেখে। ভবা খুব স্বাভাবিকভাবেই ওদের সঙ্গে কথা বলছিল। অথচ, দিনের বেলা লোকটা একেবারেই অন্যরকম। ওর চিৎকার-চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক তিষ্ঠোতে পারে না। দোকানের সামনেই রয়েছে একটা নর্দমা। মাঝে-মাঝে সেটা ভরে গিয়ে ফুটপাথ ভাসিয়ে দেয়। আজ বৃষ্টি হচ্ছিল বলে, কোন্‌টা নর্দমার জল আর কোন্‌টা বৃষ্টির জল টের পাওয়া মুশকিল। তার ওপর রাস্তা ভীষণ এবড়ো-খেবড়ো। ফলে এই বৃষ্টিতেই জল জমে গেছে। ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি এমন জোরে ছোটে যে, জল ছিটিয়ে চারপাশে সব চিত্র-বিচিত্র করে দেয়। সেজন্য শুভ্র আজ ফুটপাথ ধরে এগোচ্ছিল। কিন্তু সুন্দর পোশাক-পরা লোক দুজনের সঙ্গে ভবাকে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারল না। শুভ্র থমকে দাঁড়িয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। একজন লোক ভবাকে বলছিল, "ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আগামী সপ্তাহেই সব পেমেন্ট পেয়ে যাবেন।"

ভবা বলল, "একটা-দুটো টাকা নয়, চোদ্দ হাজার টাকা। পেমেন্ট দেরি করে দিলে আমাদের চলে কী করে?" কথাটা বলেই শুভ্রকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই ভবা পরিচিত ভঙ্গিতে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

শুভ্র দৌড়ে বড় রাস্তায় এসে পৌঁছল। কেউ ওর পিছু নিয়েছে কি না সেটা দেখতেও ভুল করল না ও। রাস্তার ও-পারেই বড় ওষুধের দোকান। দোকানে অনেক লোকের ভিড়। ওষুধ কিনে দোকান থেকে বেরোতেই সাফারি পোশাকের এক ভদ্রলোকের মুখোমুখি পড়ে গেল শুভ্র। এই লোকটাই যে একটু আগে ভবার সঙ্গে কথা বলছিল, সেটা বুঝতে ভুল হল না শুভ্রর।

লোকটা শুভ্রকে দেখেই হেসে বলল, "তুমি এ-পাড়াতেই থাকো বুঝি?"

শুভ্র নির্ভয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"তুমিই না সেই খুদে ক্যামেরাম্যান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে তো চিনতে পারছি না।"

লোকটা উত্তর দিল, "ভবার আত্মীয় আমি। তোমার কীর্তিকাহিনী আমরা সবাই জানি।"

শুভ্রও স্বাভাবিক গলা করে বলল, "সে তো অনেক দিন আগের কথা।"

"বেশি দিন আর কোথায়। বছর দেড়েক আগের ঘটনা। তোমাকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ হয়েছিল সে সময়। তুমি হচ্ছ সত্যিকারের দেশের সম্পদ। বুদ্ধি খাটিয়ে কীভাবে তুমি ডঃ সন্তোষ মিত্রের ছদ্মবেশ খুলে দিয়েছিলে, তা কি অত সহজে ভোলা যায় ?"

শুভ্র বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে আরও কথা বলার ইচ্ছে ছিল কিন্তু কী করব বলুন, আমাকে এখুনি বার্লি কিনে বাড়ি ফিরতে হবে। আপনার কথা বাড়ি গিয়ে বলব।"

লোকটা হেসে ফেলল সে কথায়। বলল, "বলবে বইকী ! তবে কী জানো, তোমাকে একটা কথা না বলে পারছি না।"

"কী কথা ?"

লোকটা গুছিয়ে বলল, "কৌতূহল থাকা ভাল, কিন্তু সব সময় অতি কৌতূহল মানুষের ক্ষতিও করে।"

শুভ্র সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, "এ কথা বলছেন কেন ?"

লোকটা বলল, "ভবা আমার ভাগ্নে। ওর সঙ্গে দেখা হলেই হাজার-হাজার টাকার গল্প করতে হয়। রাখালবাবুর ছেলে তো। দু-দশ টাকার কথা ভাবতেই পারে না। চোদ্দ হাজারের কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেছ, তাই না ?"

শুভ্র ঠিক সেই ফাঁকে দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা আর একজনকে দেখেই বুঝল, এ-লোকটাকেও সে সময় ভবার দোকানের সামনে দেখেছে। কিন্তু এবার ও খুব সচেতন হয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"তা অমন করে ছুটে পালালে কেন ?"

শুভ্র উত্তর দিল, "আমরা তো রোজই ওর পেছনে লাগি। ও সঙ্গে ঢিল রাখে ; তাই ঢিলের ভয়ে ছুটে পালিয়েছি।"

"ছিঃ। তোমার মতো বুদ্ধিমান ছেলের কি পাগলের পেছনে লাগা উচিত ? ওরা কত অসহায় জানো ?"

শুভ্র লজ্জিত হল সে-কথায়। বলল, "আর কখনও করব না। ছোটকাকা না খেয়ে আছেন, বার্লি কিনতে যাব।"

লোকটা শুভ্রর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, "আর কখনও ওর পেছনে লেগো না। মনে রেখো, ওর কথার কোনও মানে নেই। সবই প্রলাপ।"

শুভ্র উত্তর দিল, "আমি আপনার কথা মনে রাখব।"

লোকটা লম্বা সিগারেট ধরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "জাস্ট লাইক এ গুড বয়। যাও। দেরি কোরো না।"

ছাড়া পেয়েই শুভ্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সতর্ক ভঙ্গিতে বাজারের ভেতর ঢুকে মুদিখানা থেকে বার্লির কৌটো কিনে বাজারের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘুরপথে বাড়ি এসে পৌঁছল। ভবার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, লোকটার কথা, চোদ্দ হাজার টাকা—এ-সবই ওকে ভীষণ চিন্তায় ফেলল। বাড়িতে ঢুকে বাবার গলা পেয়ে ঘাবড়ে গেল শুভ্র।

সৌরেনবাবু বলছিলেন, "কত দিন বারণ করেছি, অমু শরীরের যত্ন নে। কানেই ঢোকেনি। খালি টো-টো করে রোদে-জলে ক্যামেরা ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়ানো, দেখবি একদিন বিপদে পড়বি। তখন লিকলিকে হাতের বাইসেপ ফুলিয়ে বলেছিলি, এ শরীরে রোগের প্রবেশ নিষেধ। এখন বোঝো, টাইফয়েড কাকে বলে। পড়ে থাকো চিত্তির হয়ে দু-মাস।"

শুভ্র ওষুধ আর বার্লি মা'র হাতে দিয়ে বলল, "রোগ হয়েছে তো কী ? বাবা এত রেগে গেলেন কেন ?"

অর্চনা দেবী বললেন, "চুপ, উনি যেন শুনতে না পান। এখন কেউ কোনও কথা বললে আরও রেগে যাবেন। যা বলছেন, বলুন। একটু পরেই দেখবি, তোর ছোটকাকার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।"

অর্চনা দেবীর হাতে সদ্য-কেনা ওষুধ আর বার্লির কৌটো দেখে সৌরেনবাবু বললেন, "এ-সবে আর কাজ হবে না। নিলুডাক্তারকে রিপোর্ট দেখিয়ে এখুনি ঠিক ওষুধের ব্যবস্থা করি গে।" সৌরেনবাবু বেরিয়ে গেলেন নিলুডাক্তারের উদ্দেশে।

শুভ্র ছোটকাকার ঘরে ঢুকে বলল, "কেমন বকুনি খেলে বাবার কাছে ?"

অমিতজ্যোতি কৃত্রিম রাগের গলায় বললেন, "গেট আউট ফ্রম হিয়ার। শুনিসনি আমার টাইফয়েড।"

শুভ্র বলল, "তা কী ?"

অমিতজ্যোতি বললেন, "বউদিকে চটপট একটু চা করতে বল্ তো ? দাদা আসার আগেই যেন সেরে ফেলতে পারি।"

শুভ্র গম্ভীর মুখে বলল, "ও-সব তোমার চলবে না। শিগ্‌গির সেরে ওঠো ছোটকাকা। আমি যে ফের আর একটা রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি।"

অমিতজ্যোতি হেসে বললেন, "তার মানে, আবারও তোর ছবি খবরের কাগজে বেরুবে।"

শুভ্রও চট করে উত্তর দিল, "তাই যদি হয় তো এবার তোমাকে ছাড়া একটা ছবিও আমি ক্লাউকে তুলতে দেব না।"

অমিতজ্যোতি বললেন, "আগে সেরে উঠি, তারপর তো !"

॥ পাঁচ ॥

শুভ্র একমনে ডায়েরি লিখছিল : সন্দেহের বীজ ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। অপরিচিত লোক দুজন সত্যিই কি ভবার আত্মীয় ? ওদের দু'জনেরই দামি পোশাক, ফর্সা রং, টান-টান চেহারা, ব্যাকব্রাশ-করা চুল। লোকটার কথা বলার ধরন দেখলে মনে হয়, লোকটা শিক্ষিত। আসলে ও কি আমাকে ভয় দেখানোর জন্য এ-সব বলল, না, যা বলল তার সবটাই সত্যি ? ওদের আগে এ-পাড়ায় কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। সবচেয়ে আমাকে বিস্মিত করছে ভবার আচরণ। ও বেশ কায়দা করে সিগারেট টানছিল। অনভ্যস্ত লোক কখনও কি পারে ওইভাবে ধোঁয়া ছাড়তে ? ছোটকাকার কাছ থেকে জেনেছি, দোকানটার জন্য ভাড়া গুনতে হবে না ভবাকে আরও দশ বছরের জন্য। কেননা, রাখালবাবু দোকানটা একান্ন বছরের লিজ নিয়েছিলেন। এ-ছাড়াও ও বনেদি ঘরের ছেলে।

সুমীত ব্যবহারে বহুবিধ সুবিধে

এই মেশিনের সব কাজ তার প্রাণকেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত

এর হেভী ডিউটি মোটর না থেমে ৩০ মিনিট চলতে পারে।
বিশেষ ডিজাইনে তৈরী চারটি ব্লেড ও অল্প পরিমাণ পেষাই করার ক্যাপযুক্ত
এই সুমীত ডোমেস্টিক কিচেন মেশিন কত সহজে রান্নার
মূল সরঞ্জাম বানিয়ে দেয়।

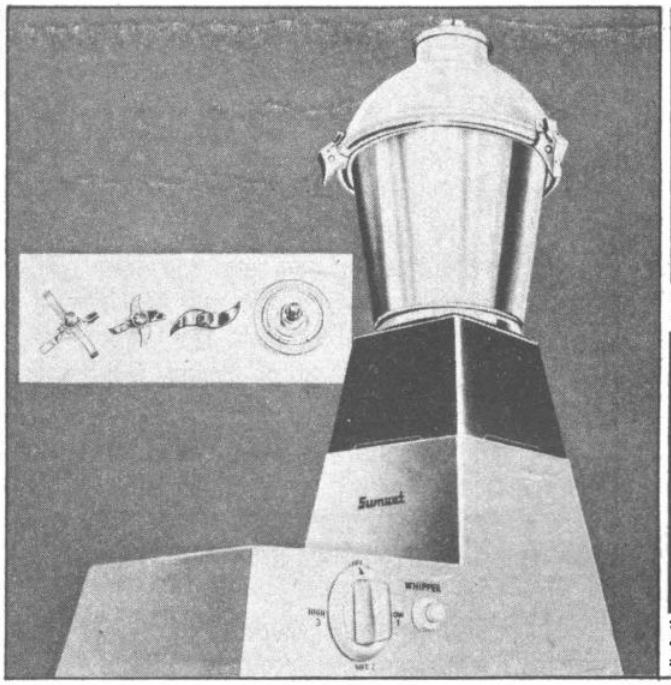

লঙ্কা আর গরম মশলা
২ মিনিটে গুঁড়িয়ে পেষাই।

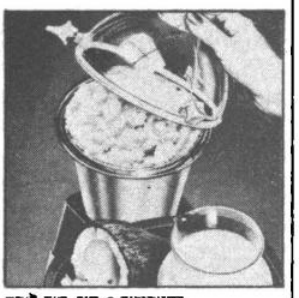

কড়াই ডাল, চাল ও নারকোলের
নাঁস ২ মিনিটে ভিজে পেষাই।

মাংস কিমা করে ১ মিনিটে আর
পাজর, পেঁয়াজ, নারকোল ও বাদাম
কুরে দেয়...কয়েক সেকেণ্ডে।

লস্যি, দুধ আর ডিমের সাদা
অংশ ফেটায় ১ মিনিটে।

এখন যোগ হ'ল সুমীত ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেণ্ট

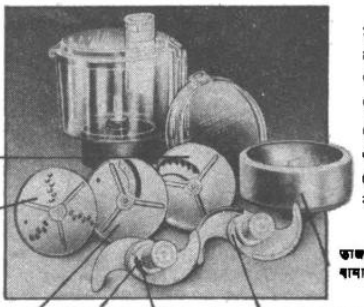

সুমীত আপনাকে দিচ্ছে আর একটা বিশেষ সুবিধে—
নতুন ঐচ্ছিক ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেণ্ট লাগিয়ে
আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন। এতে আছে স্বচ্ছ
অথচ ভাঙ্গে না এমন একটি ৩.৮৮ লিটারের পাত্র,
৫টি বদলযোগ্য ব্লেড ও ডিস্ক আর রস করবার যন্ত্র।
এই অ্যাটাচমেণ্টটি আপনি আপনার সুমীত ডোমেস্টিক
বেসিক ইউনিটে লাগিয়ে দিন, ব্যস্, আর দেখুন
কী বিস্ময় সৃষ্টি করে!

সুমীত®

৪০০ ওয়াট ২২০-২৪০ ভোল্ট~ ৩০ মিনিট রেটিং

শক্তপোক্ত রান্নার ঝক্কি সামলাতে শক্তপোক্ত ভাবে তৈরী।

আমাদের বিনামূল্যে প্রদর্শনী দেখার অপেক্ষায় থাকুন আর সুমীত আপনার কি কি কাজ কি ভাবে করছে—চাক্ষুস দেখুন।

সার্ভিস সেণ্টার:

কলকাতা: কে দত্তপানি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা. লি, ৫৫, এজরা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ ফোন: ২৬৬৭২৮/২৯। সুমীত সার্ভিস সেণ্টার (দক্ষিণ) পি-৪৯৮ কেয়াতলা রোড, দু'তলা, কলকাতা-৭০০ ০২৯ ফোন: ৪৬৬১১৬। **গৌহাটী:** এইচ. ভি. ট্রেডার্স, ডুগার বিল্ডিং, ফ্যান্সী বাজার, গৌহাটি, আসাম-৭৮১০০১ ফোন: ২৮০২৮

OBM/3187 BEN

সুতরাং, সন্দেহ করার কিছুই নেই। তবু আমার মন বলছে, কিছু না। কিন্তু কিছু-না-কিছু রহস্য এর পেছনে আছেই আছে। তা না হলে, ভবা আমাকে দেখামাত্রই চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেছিল কেন ? ওর চোদ্দ হাজার টাকার কথা কি সত্যিই প্রলাপ ? আর লোক-দুটোই বা আমাকে অনুসরণ করল কেন ? কেনই বা লোকটা আমাকে বেশি কৌতূহলী হতে বারণ করল ?

রজত ঘরে ঢুকে ওকে ডায়েরি লিখতে দেখে বলল, "কী লিখছিস ডাইরিতে, দেখা তো ?"

শুভ্র বলল, "ব্যক্তিগত ডায়েরি যদিও কাউকে দেখানো ঠিক না, তবুও তোকে না দেখিয়ে পারছি না," বলেই রজতের দিকে ডায়েরিটা এগিয়ে দিল।

রজত ডায়েরি পড়ল মন দিয়ে। খুবই চিন্তিত মুখ করে বলল, "মিস্টিরিয়াস !"

শুভ্রও খুব গম্ভীর গলা করে বলল, "হুঁ।"

রজত বলল, "কী করা যায় বল তো ? বাবাকে বললে হয় না ?"

শুভ্র উত্তর দিল, "না রে ! কাকাবাবুর কত কাজ। নেহাত সন্দেহের বশে কাকাবাবুকে বিব্রত করা ঠিক হবে না। আমার মনে হয়, আমাদের আরও সতর্কভাবে নজর রাখতে হবে। লোক-দুটো আমাকে চিনে ফেলেছে, সুতরাং তোকেই এবার কিছুটা অ্যাকটিভ হতে হবে। কায়দা করে, ভবার দোকানের ভেতরের একটা ছবি তুলতে হবে তোকে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, দুপুরে ভবা মাদুর পেতে শো-কেসের আড়ালে ঘুমোয়। ও টের না পায়, এরকম কৌশলে ছবি তোলার কাজটা সেরে ফেলতে হবে তোকেই।"

অমিতজ্যোতির জ্বর দু-দিন হল আর নেই। ডাক্তারের পরামর্শমতো আজ মাছের ঝোল ভাত খাবেন। সৌরেনবাবু সকালবেলাই বাজার থেকে মাগুরমাছ আর কাঁচকলা নিয়ে এসেছেন। একনাগাড়ে শুয়ে থেকে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন অমিতজ্যোতি। কিছুতেই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হল না তাঁর। ধীর পায়ে শুভ্রর ঘরের দিকে এগিয়েই ওদের দুজনের কথাবার্তা শুনতে পেয়েই অনেক কষ্টে হাসি চেপে ঘরে ঢুকলেন। অমনি শুভ্র বলে উঠল, "এখনও পেটে ভাত পড়েনি। কী দরকার ছিল উঠে আসার ?"

অমিতজ্যোতি করুণ মুখ করে বললেন, "দাদা-বৌদির শাসনে প্রাণ গেল, তার ওপর তোদের গার্জেনি ! আর পারি না !"

রজত বলল, "তা তো বলবেনই, আমরা খালি আপনাকে বিরক্ত করি, তাই না ?"

অমিতজ্যোতি খাটে বসে দু'জনকে দুপাশে বসিয়ে বললেন, "তোদের মাথায় ভূত চেপেছে। ভবাকে নিয়ে অত কি চিন্তার আছে বুঝে পাচ্ছি না। আমার মনে হয়, বাজে গোয়েন্দা বই পড়ার কুফল এসব। বলি কী, যত শিগ্‌গির পারিস ওসব ভুলতে চেষ্টা কর।"

শুভ্র বলল, "তুমিই তো যত গণ্ডগোলের মূল !"

"কেন ? আমি কী করলাম ?"

রজত বলল, "আপনি অসুখে না পড়লে তো আমরা কবেই বিষ্ণুপুর চলে যেতে পারতাম।"

অমিতজ্যোতি বিষণ্ণ গলায় বললেন, "ঠিক বলেছিস। বিষ্ণুপুর থেকে ঘুরে এসে অসুখে পড়লে কোনও দুঃখই হত না।"

শুভ্র চটজলদি উত্তর দিল, "আমরা তার জন্য মোটেই দুঃখিত নই। বিষ্ণুপুর তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না ?"

অমিতজ্যোতি একগাল হেসে উত্তর দিলেন, "তা যাচ্ছে না ঠিকই, তবে কী জানিস, তোদের অনেক দিনের সাধ, সেটা পূরণ করতে না পারায় আমারও খুব খারাপ লাগছে। যাকগে, যে-জন্য এসেছিলাম সেটাই বলতে ভুলে গেছি। আমার এটাই হচ্ছে মস্ত দোষ।" কথা শেষ করেই শুভ্রর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "তোকে থ্যাঙ্কস্ দিতে এসেছি শুভ্র।"

"বিনা কারণে থ্যাঙ্কস দিচ্ছ না বুঝতে পারছি কিন্তু কেন তা জানতে পারলে বুঝতাম, সে যোগ্যতা আমার আছে কি না ?"

অমিতজ্যোতি বললেন, "তোর সেদিনের পরামর্শ যে কী কাজের হয়েছে, তা এখন বুঝতে পারছি।"

শুভ্র ধাঁধায় পড়ে গেল। বলল, "আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না ছোটকাকা।"

খুক-খুক করে কেসে অমিতজ্যোতি বললেন, "এত শর্ট মেমারি তোর কী করে হল বুঝতে পারছি না। দোকানে কর্মচারী রাখার কথা বলেছিলি, সেটা উপেক্ষা করিনি আমি। তোর কথা এতই মনে ধরেছিল যে, সত্যি একজন কর্মঠ আর এক্সপার্ট লোক পেয়ে গেছি।"

রজত প্রশ্ন করল, "বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন নাকি ছোটকাকা ?"

অমিতজ্যোতি সবিস্তারে বলতে থাকেন, "না রে, একদিন একজন নেগেটিভ নিয়ে ফোটো এনলার্জ করতে এল। একজন বৃদ্ধের মুখ। কয়েকশো আঁকিবুকি আছে সে মুখে। কী অসাধারণ ফোটোগ্রাফি না দেখলে বুঝতে পারবি না। ছবি নিতে এলে, ও কী করে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জানাল, দু-তিনটে টিউশান করে। টাকা বাঁচিয়ে ফিল্ম কিনে শখের ছবি তোলে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছবি পাঠায়। কোনওটা ছাপা হয়, কোনওটা হয় না। ছাপা হলে তিরিশ-চল্লিশ টাকা পায়। কাজের কথা বলতেই রাজি হয়ে গেল। জানা নেই, শোনা নেই, দুম করে তো একজনকে দোকানে বসানো যায় না। ঠিকানা রেখে গিয়েছিল ছেলেটা। যে পাড়ায় ও থাকে, সেখানে গোপনে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, ছেলেটি খুবই ভাল। পরে ওর বাড়ি গিয়ে ওর বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলেছিলাম। শিক্ষিত আর রুচিশীল ওদের পরিবার। ছেলেটি অবশ্য সে-সময় বাড়ি ছিল না, ওর বাবা-মাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম। পরের দিন সকালেই ও এসে হাজির। কাজে লাগিয়ে দিলাম। ওকে যদি না পেতাম, এতদিন দোকান বন্ধ রাখতে হত। দোকানের গুড উইল নষ্ট হত। কেননা যাদের অর্ডার ছিল, তাদের ঠিকমতন সাপ্লাই দিতে পারতাম না।"

শুভ্র বিস্মিত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, "ওকে তো একদিনের জন্যও বাড়িতে আসতে দেখিনি।"

মুচকি হেসে অমিতজ্যোতি বললেন, "ওর সঙ্গে দাদাই এখন যোগাযোগ রাখছেন।"

"সে কী ? বাবাকে তুমি দোকানদারিতে লাগিয়ে দিয়েছ ?"

"কেন ? দোকানদারি করা খারাপ কাজ নাকি ?"

"না, না। খারাপ হবে কেন, তবে বাবার মতো কেজো

মানুষ কী করে এ-সব করছেন বুঝতে পারছি না। সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছ তুমি ছোটকাকা।"

অমিতজ্যোতি বললেন, "দায়িত্ব জিনিসটা বড় সাংঘাতিক। ওটা ঘাড়ে চাপলে কুঁজোও সোজা হয়ে দাঁড়ায়।"

রজত আর শুভ্র সে কথায় না হেসে পারে না। ঠিক সে সময় ওরা বাইরে থেকে ছোটকাকাকে কে যেন ডাকছে শুনতে পেল।

শুভ্র একদৌড়ে বারান্দায় এসে দ্যাখে, ছোটকাকার বন্ধু শিবুকাকা কোঁচানো ধুতি-পাঞ্জাবি পরে নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। শিবুকাকাকে লক্ষ করে বলল, "ওপরে চলে আসুন!"

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে-উঠতে শিবুকাকা বললেন, "কেমন আছ ক্যামেরাম্যান?"

"ভালই। আপনি ভাল আছেন?"

শিবুকাকু বললেন, "আমি সব সময়ই ভাল। অমু এখন কেমন আছে?"

"দু'দিন ধরে জ্বর নেই। আজ ভাত খাবেন।"

"মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত তো, গ্র্যাণ্ড খেতে কিন্তু। ভাবছি, আমিও ওর সঙ্গে দুটো খেয়ে যাব।"

"সে তো খুব ভালই হবে।"

ঘরে ঢুকেই শিবুকাকু অমিতজ্যোতিকে দেখেই বললেন, "শাবাশ! কী চেহারাই বানিয়েছিস অমু?"

অমিতজ্যোতি অভিমানী গলা করে বললেন, "এতদিন কোথায় ছিলি? আজ মাগুর মাছের গন্ধ পেয়েই বাড়িতে সেঁধিয়েছিস যে বড়। অকাজের ঢেঁকি!"

শিবুকাকু বললেন, "কাজ করেই যদি খাব তো জমিদার বংশে জন্মালাম কেন?"

শুভ্র দুম করে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোনও কাজ করেন না শিবুকাকা?"

শিবুকাকু উত্তর দিলেন, "ও কথা অমুকে প্রায়ই বলি! কাজ না করে কি কেউ পারে?"

অমিতজ্যোতি সহাস্যে বললেন, "শিবু এসেছে, বৌদিকে গিয়ে বল। আর বলবি, ও-ও আমার সঙ্গে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবে।"

শুভ্রকে যেতে বারণ করে শিবুকাকু বললেন, "তুই কী রে অমু? মিছিমিছি নীরোগ শরীরে মাগুর মাছের ঝোল খেতে যাব কেন? একটা জরুরি কাজে তোর কাছে এসেছি। ফ্যামিলি সুদ্ধু সকলকে নিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্য হরিদ্বার যাব! বাড়ি খালি রেখে যেতে ভরসা পাচ্ছি না। আমরা না ফেরা পর্যন্ত তুই যদি বাড়িটায় থাকিস তো খুব ভাল হয়।"

অমিতজ্যোতি চিন্তিত মুখে বসে রইলেন।

শুভ্রর সে সময় লক্ষ্মী জুয়েলারির ভবার কথা মনে পড়ে গেল। শিবুকাকার বাড়ির ঠিক উলটো দিকে লক্ষ্মী জুয়েলারি। কিছু হোক আর না হোক শিবুকাকুর বাড়িতে থাকতে পারলে একটা কিছুর কিনারা করতে পারবে ভেবে রোমাঞ্চ অনুভব করল।

অর্চনা দেবী চা নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, "অনেকদিন পর এলেন।"

চায়ের কাপ নিয়ে শিবুকাকু সহাস্যে বললেন, "অনেকদিন আপনার রান্না খাই না বৌদি। হরিদ্বার থেকে ফিরে এসে জমিয়ে খেয়ে যাব। যাওয়ার আগে বাড়ির চাবি তোকে দিয়ে যাব।" চা শেষ করে শিবুকাকু অমিতজ্যোতির পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "সাবধানে থাকবি কিন্তু।" কথা শেষ করেই সদাহাস্যময় শিবুকাকু বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ছয় ॥

শুভ্রর কথা খুবই মনে ধরেছিল রজতের। বাড়ি ফেরার পথে ইচ্ছে করেই সতর্ক চোখে লক্ষ্মী জুয়েলারির পাশ দিয়ে ঘুরে এল। নতুন কিছুই চোখে পড়ল না। ভবা চেয়ারে বসেই ঝিমোচ্ছিল। ভাবল, এতদিন এ-দোকানটার কোনও আকর্ষণই ছিল না; এখন এটাই হয়ে উঠেছে ভীষণ রহস্যময়। সন্ধে ছ'টার কিছু পরে ও-বাড়িতে এসে পৌঁছল। মুখ-হাত ধুয়ে ডায়েরি লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এতদিন যা-যা শুনেছিল সে সবই লেখা আছে। আলিগড় থেকে আসা পিসতুতো দাদা আর দিদিকে নিয়ে দিনকয়েক যা-যা করেছে সবই লিখে রেখেছিল। এবার ভবার প্রসঙ্গে শুভ্রর কাছ থেকে শোনা সব কিছু গুছিয়ে লিখে ফেলল। এবার ওর মনখারাপ হয়ে গেল এই ভেবে যে, শুভ্র আগামীকালই শিবুকাকুর বাড়ির বাসিন্দা হবে বলে। ও-ও যদি ওর মতো দিনকয়েকের জন্য ও বাড়িতে থাকতে পেত তো খুবই আনন্দে দিন কাটাতে পারত। কিন্তু ও জানে বাবা-মা কিছুতেই ওকে ছেড়ে থাকতে চাইবেন না। এ-সবই যখন ভাবছিল রজত, সেই সময় রাজীববাবু ওর ঘরে ঢুকে বললেন, "চুপচাপ বসে আছিস যে? কী হয়েছে?"

"কিছু হয়নি তো!" রজত উত্তর দিল।

রজতের মা এ সময় ঘরে ঢুকেই বললেন, "ও বাড়িতে যাবি যা, কিন্তু যখন-তখন রাস্তায় বেরুবি না।"

রজত অবাক হয়ে মা'র দিকে চেয়ে আছে দেখে রাজীববাবু বললেন, "মনখারাপ করেছিলি তো? বোকা কোথাকার। একটু আগেই অমিতজ্যোতিবাবু ফোনে সব বলেছেন। তুই থাকলে ওরা আনন্দ পাক এটা আমিও চাই। আমি রাজি হয়ে গেছি।"

কথাগুলো কানে যেতেই রজতের মন খুশিতে ভরে গেল।

রজতের মা বললেন, "যা যা নেবার সব আমি গুছিয়ে দেবখন। জলখাবার খাবি আয়।"

রজত মা'র পিছু-পিছু এগিয়ে যেতে লাগল। রাজীববাবু এ-সময় দেখলেন, রজতের ডায়েরি টেবিলের ওপর পড়ে আছে। ডায়েরিতে কী লেখে এটা দেখার কৌতূহল হল ওঁর। সব কিছু পড়ে ফেলতে বেশি সময় লাগল না। বড় করে শ্বাস ফেললেন রাজীববাবু। তবে আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে, ওরা নির্বোধ নয়, আর এমন কোনও কাজ করবে না যা ওদের বিপদে ফেলতে পারে। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন, এ ব্যাপারে শুভ্র এখনও কিছু বলেনি কেন সেটাই আশ্চর্য! পরের দিন রজত শুভ্রদের সঙ্গে শিবুকাকার বাড়ি চলে এল। ভবা দোকান খুলেছে ইতিমধ্যে। ছোট ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই বিরক্ত করছে ভবাকে।

অমিতজ্যোতি বললেন, "উইলফোর্স কথাটা মিথ্যে নয় দেখছি।"

শুভ্র বলল, "হঠাৎ উইলফোর্সের কথা কেন ছোটকাকা?"

অমিতজ্যোতি বললেন, "বাইরে যাওয়ার ইচ্ছেটা আপাতত শিবুর বাড়িতেই পুষিয়ে নেওয়া যাবে।"

শুভ্র বলল, "দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে?"

"ঘোলই বা ক'জনার কপালে জোটে বল ?"

শুভ্র ব্যাজার মুখ করে বলল, "এগারোটার মধ্যে খাবার আনতে যাব, রাতে বাবা কষ্ট করে খাবার দিয়ে যাবেন, ধ্যেত্ ভাল্লাগে না ! আমরা যদি পিকনিক করতে পারতাম তো খুব মজা হত।" নানান কথায় সময় এগিয়ে যেতে লাগল। পৌনে এগারোটা নাগাদ শুভ্র খাবার আনার জন্য বেরিয়ে গেলে রজত অমিতজ্যোতিকে নিয়ে ক্যারাম খেলায় মেতে গেল। দুপুরে খাওয়ার পরই অমিতজ্যোতির শরীর ছেড়ে দিল। ক্লান্ত শরীর বলেই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। বেলা দুটোতে ওষুধের কথা ভুলল না শুভ্র। ছোটকাকাকে ঘুম থেকে তুলে ওষুধ দিল।

অমিতজ্যোতি বললেন, "তোরা চা খাস না, নইলে···।" কথা শেষ না করেই হেসে বললেন, "একদিন তোরাও না-হয় অনিয়ম করলি।"

"বেশ তো, খাব।" শুভ্র উত্তর দিল।

রজত আগ বাড়িয়েই বলল, "আমি ওই সামনের দোকান থেকে চা নিয়ে আসি কেতলি করে ?"

শুভ্র বা অমিতজ্যোতি অমত করল না সে-কথায়।

রজত ধীর পায়ে চা কিনে লক্ষ্মী জুয়েলারির ফুটপাথ ধরে এগিয়ে এল। খুব সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখল, শো-কেসের আড়ালে ভবা শুয়ে নেই। বসে বসে খুটখাট করে কী যেন করছে। সন্দেহ তীব্র হলেও নিজেকে সামলে নিল রজত। দ্রুত পায়ে বাড়িতে ঢুকে দেখল, ছোটকাকা একমনে পেশেন্স খেলছেন, শুভ্র একটা গল্পের বইয়ে ডুবে আছে।

রজতকে দেখেই অমিতজ্যোতি বললেন, "কতদিন পর জমিয়ে একটু চা খাব।"

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল রজত, "আপনি তাস খেলুন, আমরা বরং ও-ঘরে গিয়ে বসি।"

শুভ্র বুঝল, রজত নিশ্চয়ই কিছু-একটা বলার জন্য কায়দা করে ও-কথা বলেছে। ওরা দু'জনই পাশের ঘরে চলে এল। রজত উৎকণ্ঠিত ভঙ্গিতে ভবা দোকানে কী করছে সে-সবই বলে গেল।

সব শুনে চিন্তিত ভঙ্গিতে শুভ্র বলল, "মিস্টিরিয়াস !"

রজত বলল, "আজ রাতে আমরা একটু নজর রাখব, কী বলিস।"

"ছোটকাকা যেন টের না পান।" শুভ্র বলল।

"খেপেছিস ! শোন, তুই বারান্দায় বেশি যাস না ; যা লক্ষ রাখার আমিই রাখব।"

দেখতে দেখতে সূর্য পশ্চিমে অস্ত গেল। পাখিরা ঘরে ফিরছে। দোকানে রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল। আটটা নাগাদ সৌরেনবাবু রাতের খাবার দিয়ে গেলেন। বেশি কথা বললেন না। যাওয়ার সময় অমিতজ্যোতির কপালে হাত ছুঁইয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

সৌরেনবাবুর গুরুগম্ভীর চেহারা দেখে অমিতজ্যোতি ফিকফিক করে হাসছিলেন।

রজত প্রশ্ন করল, "হাসছেন কেন ?"

অমিতজ্যোতি বললেন, "দাদা যে কী করে হাসির গল্প লেখেন বুঝে পাই না।"

শুভ্র বলল, "হাসির গল্প যাঁরা লেখেন তাঁরা কি সব সময় হাসেন নাকি ?"

রজত বলল, "আমারও খুব অবাক লাগে। যাঁর মাথায় অঙ্ক গিস্‌গিস্ করছে তিনি কী করে ও-সব লেখেন বুঝি না।"

শুভ্র বলল, "আইনস্টাইন, সত্যেন বসু বেহালা বাজাতে পারতেন জানিস ? জগদীশ বসুও ভাল গল্প লিখেছেন ; রাজশেখর বসুও তাই। এতে অবাক হওয়ার কী আছে ?"

অমিতজ্যোতি মুখ টিপে হাসছিলেন। টিভিতে সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। হিন্দি সংবাদ শুনেই ওরা খেতে বসল। রাত দশটার মধ্যেই অমিতজ্যোতিকে ওষুধ খাইয়ে আলো নিভিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল শুভ্র। নিজেদের ঘরে ওরা নীল আলো জ্বেলে বারান্দায় বসে রইল কিছুক্ষণ। ফুরফুরে হাওয়ায় ওদেরও ঘুম পেয়ে গেল। দেরি না করে ওরা আলো নিভিয়েই শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে সৌরেনবাবুর গলা পেয়ে ওরা যখন উঠল তখন বেলা সাতটা। ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেল ওরা। অমিতজ্যোতি তখনও ঘুমোচ্ছিলেন।

সৌরেনবাবু বললেন, "ভাগ্যিস দরোয়ান রেখে গিয়েছিল শিবু। নইলে তো ঢুকতেই পারতাম না। নতুন জায়গায় কারও এত ঘুম হয়, তা তোদের না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না। জলখাবার দিয়ে গেলাম। আধ ঘণ্টার পর অমুকে তুলে খেতে দিস। অনেক কাজ আমার। বেশি হৈ-হৈ করিসনে।" কথা শেষ করেই চলে গেলেন সৌরেনবাবু।

এবার ছোটকাকার ঘরে ঢুকেই ওরা বিস্ময়ে হতবাক। দেখল, ছোটকাকা বিছানায় বসে ফ্রি হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ করছেন।

শুভ্র বলল, "খালি পেটে এসব কী হচ্ছে ?"

অমিতজ্যোতি বললেন, "কী করি বল ? কাজ ছাড়া আমি একদণ্ড থাকতে পারি না।"

"বাজে বোকো না, মুখ-হাত ধুয়ে জলখাবার খেয়ে ওষুধ খাবে এসো।"

অমিতজ্যোতি আড়মোড়া ভেঙে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলে রজত আর শুভ্র জলখাবার সাজিয়ে রাখল।

জলখাবার খেতে খেতে অমিতজ্যোতি বেশ রাশভারী গলায় বললেন, "আজ তোদের একটা সারপ্রাইজ দেব।"

"দরজা বন্ধ করে আয়। জানিস তো দেয়ালেরও কান থাকে।"

এতে আরও বেশি উত্তেজিত হল ওরা। রজত উঠে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে ছোটকাকার মুখোমুখি বসে রইল চুপটি করে।

অমিতজ্যোতি বললেন, "জানিস তো, অপরিচিত জায়গায় আমি ভাল ঘুমোতে পারি না। তবে প্রথম দিকে ভালই ঘুমিয়েছিলাম। রাত যখন প্রায় দুটো সে সময় আমার ঘুম ভেঙে যায়। তোদের ঘরে এসে দেখি, তোরা ঘুমিয়ে কাদা, তখনই বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ শুনতে পাই। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দেখি কী, দুজন বলিষ্ঠ চেহারার লোককে সঙ্গে করে ভবা দোকান খুলে ভেতরে ঢুকল। এত রাতে ওরা দোকানে এল কী করে ? আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওরা দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। যে মানুষ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে সেই কিন্তু দোকান বন্ধ করে স্বাভাবিক মানুষের মতো হেঁটে চলে গেল।" এ পর্যন্ত বলেই অমিতজ্যোতি দু'জনকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখছিলেন।

শুভ্রও আর পারল না এতদিনকার গোপন কথা চেপে রাখতে। ও সবিস্তারে সব বলে গেল। রজতও সঙ্গে সঙ্গে বলল, "সেবারের মতো এবারও বাবার হেল্প নিলে হয় না ?"

শুভ্র বলল, "অত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে ? যদি এর মধ্যে আর কিছু না ঘটে তো বুঝতে হবে আমাদের সব সন্দেহই বোগাস।"

অমিতজ্যোতি প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন, "শুভ্র, একবার বাড়ি যা। চুপিচুপি বৌদিকে একটু মাছের ঝাল পাঠিয়ে দিতে বলিস।"

শুভ্র যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। ও দেরি না করে তক্ষুনি ঘর থেকে এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কী মনে করে ও প্রথমে নিজেদের বাড়ি না গিয়ে সোজা হাজির হল রজতের বাড়ি। রাজীববাবুর বাড়ির সামনে তখনও পুলিশের লাল রঙের জিপটা দাঁড়িয়ে আছে। শুভ্র সোজা ভেতরে গিয়ে দেখতে পেল সবে জগিং সেরে ছায়াঘেরা একটা জায়গায় চেয়ারে বসে টাওয়েল দিয়ে গায়ের ঘাম মুছছেন রাজীববাবু।

শুভ্রকে হঠাৎ এ-সময় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাজীববাবু, "খবর কী ক্যামেরাম্যান ?" সেবারের সেই ঘটনার পর থেকেই রাজীববাবু শুভ্রকে নাম ধরে ডাকেন না। ডাকেন 'ক্যামেরাম্যান' বলে।

শুভ্র কোনওরকম ভূমিকা না করেই বলল, "কাকু মনে হচ্ছে আর একটা রহস্যের সন্ধান পেয়েছি।" বলেই যা-যা ঘটেছে, যা-যা শুনেছে সবই গুছিয়ে বলে গেল।

রাজীববাবু খুব হালকা মেজাজেই বললেন, "মিছিমিছি তোমরা বাজে সময় নষ্ট করছ। জানো তো, সন্দেহ করতে করতে রোগে দাঁড়িয়ে যায়। যত তাড়াতাড়ি পারো ও-সব মন থেকে মুছে ফেলো। সেবার তোমার কাকা ইনভলভ্ ছিলেন বলে আমি গুরুত্ব দিয়েছিলাম। এখন মিছিমিছি সময় আর ম্যানপাওয়ার নষ্ট করতে যাব কেন ? বাড়ি যাও। বাড়িতে গিয়ে তিনজনে মিলে মজা করে সময় কাটিয়ে দাও।"

শুভ্র নিরাশ হয়ে যখন ওখান থেকে চলে যাচ্ছিল, রাজীববাবু তখন মুখ টিপে হাসছিলেন।

॥ সাত ॥

অমিতজ্যোতি বললেন, "শিগ্‌গিরই কিন্তু সে-রাতের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। তা ছাড়া শুভ্রকে ওরা চিনতে পেরে গেছে।"

শুভ্র বলল, "আমি বোকার মতো ছুটেই ভুল করেছি।"

রজত তার উত্তরে জানাল, "ওতে লাভও কম হয়নি। তা না হলে তো ওরা তোকে ফলো করত না।"

অমিতজ্যোতি বললেন,"তা হলে বলতে চাস, ওরা সেয়ানা হয়েও ভুল করেছে।"

রজত বিশেষজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, "আলবাত ভুল করেছে, জানেন তো ক্রিমিনালরা এমন মারাত্মক ভুল করে যে তাই ওদের সর্বনাশ ডেকে আনে।"

অমিতজ্যোতি হো-হো করে হেসে বললেন, "ও সবই ট্র্যাশ ডিটেকটিভ বইয়ে লেখা থাকে। ওরা গোয়েন্দাগিরির কিচ্ছু বোঝে না।"

ঘড়িতে আটটা বাজার শব্দ হল। ওরাও সতর্ক হয়ে গেল, কেননা সৌরেনবাবু দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন রাতের খাবার নিয়ে। শুভ্র আর রজতের মা দুপুরে এসেছিলেন ভাল-ভাল খাবার নিয়ে। অমিতজ্যোতি বললেন, "বৌদিরা বড় স্বার্থপর। ছেলেদের জন্য মুখরোচক খাবার খাইয়ে গেলেন আর আমার বেলায় টুঁ-টুঁ। কত করে বললুম, মাছের ঝাল পাঠিয়ে দিতে, দিলেন না। ঠিক হ্যায়, আর একটু ভাল হয়ে নিই, একদিন চিকেন বিরিয়ানিই মেরে আসব।"

"সেলফিস। ওদের বাদ দিয়ে খাবিই তো ! এ না হলে প্রাণের কাকা।" সৌরেনবাবু কথাগুলো বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন। অমিতজ্যোতি লজ্জিত ভঙ্গিতে বসে রইলেন।

সৌরেনবাবু বললেন, "ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তোর বৌদি মাছের ঝাল পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই দ্যাখ।"

টিফিন কেরিয়ার খুলতেই সুস্বাদু রান্নার গন্ধে ঘর ভরে গেল।

সৌরেনবাবু বললেন, "আমি আর বসতে পারছি না। গল্প নেবার জন্য একজনের আসার কথা। হয়তো বসে আছে। সাবধানে থাকবি। আমি চলি।"

সৌরেনবাবু চলে গেলে ঘরে স্বস্তির হাওয়া বইল।

শুভ্র বলল, "বাবা কেমন মিষ্টি কথা শুনিয়ে গেলেন ছোটকাকা ?"

অমিতজ্যোতি আমল দিলেন না সে-কথায়। টি ভি খুলে দিলেন। সাড়ে ন'টা পর্যন্ত টি ভি দেখে সময় কাটালেন। শুভ্র ছোটককাকার জন্য সব কাজ ঠিকমতো করে নিজেরাও শুয়ে পড়ল।

অনেক রাতে বাইরের গোলমালে সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল। ওরা ঘুমচোখে বারান্দায় এসে দেখে, লক্ষ্মী জুয়েলারির সামনে দুটো পুলিশভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছু বাড়ির আলো জ্বলছে। সেদিনের দেখা দুজন লোককেও এ-সময় ভবার সঙ্গে দেখতে পেল শুভ্র। রাজীববাবু ওই দুজনকে কীসব জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। লোক দু'জন রাগান্বিত ভঙ্গিতে রাজীববাবুর কথার উত্তর দিচ্ছে। রাজীববাবু তিনজনকেই অ্যারেস্ট করার হুকুম দিতেই পুলিশও সঙ্গে সঙ্গে ওদের হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে পুলিশভ্যানে তুলেছিল। রাজীববাবুর কথামতো দুজন রাইফেলধারী পুলিশ দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। রাজীববাবু নিজের গাড়িতে ওঠার সময় ওদের না দেখার ভান করেও দেখে নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেলেন।

অমিতজ্যোতি বললেন, "আবার শুভ্রকে ঘিরে ক্যামেরাম্যান

আর রিপোর্টারদের ভিড় জমে যাবে।"

রজত বলল, "খবরের কাগজের হেডিং থাকবে খুদে গোয়েন্দার কীর্তি।"

অমিতজ্যোতি রজতের পিঠ চাপড়ে বললেন, "বেশ বলেছিস। বাকি রাত না জেগে এবার ঘুমোতে যা।"

আলো নিভিয়ে শুলেও ওরা ঘুমোতে পারছিল না।

পরদিন খুব ভোরেই রাজীববাবু এসে হাজির সৌরেনবাবুর বাড়ি।

অসময়ে রাজীববাবুকে দেখে প্রশ্ন করলেন সৌরেনবাবু, "হঠাৎ কী মনে করে এত সকালে?"

রাজীববাবু বললেন, "আপনাদের দুজনকেই এক্ষুনি ও বাড়িতে যেতে হবে।"

"কী ব্যাপার বলুন তো?"

"ওখানে গিয়ে শুনবেন।" রাজীববাবু উত্তর দিলেন।

অর্চনা দেবী ভয়ার্ত চোখে চেয়ে ছিলেন রাজীববাবুর দিকে।

তা দেখে রাজীববাবু না হেসে পারলেন না। বললেন, "ভয় নেই, চলুন।"

অল্প সময়ের মধ্যেই ওঁরা শিবু চৌধুরীর বাড়ি এসে পৌঁছুলেন।

হঠাৎ একসঙ্গে সকলকে দেখতে পেয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গেল ওরা তিনজনেই।

রাজীববাবু কোনও কথা না বলে বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে ফোন করে খবর পাঠাতে লাগলেন। সময় দিলেন সাড়ে-আটটা।

সৌরেনবাবু প্রশ্ন করলেন, "খবরের কাগজের লোকদের এখানে আসতে বলছেন কেন?"

রাজীববাবু উত্তর দিলেন, "কী আর করি বলুন। শুভ্র যে ফের কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে। আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, ওর মতো এত অল্প বয়সের ছেলের এ-ধরনের সেন্স কী করে গ্রো করল। ও একদিন লক্ষ্মী জুয়েলারির ভবার কথা বলে। তা ছাড়া রজতের ডায়েরিতে ভবার সম্পর্কে দু-চারটে মন্তব্য দেখেছি। শুভ্রকে বুঝতে দিইনি যে, ব্যাপারটায় আমি খুব গুরুত্ব দিচ্ছি। ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতির চোটে আমরা অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম। এখন তো বিয়ের ধুম পড়েছে। বিপদ-আপদ জেনেও মেয়েরা সোনার গয়না পরার লোভ সামলাতে পারে না আর সমাজবিরোধীরা এসব দিনগুলোই বেশি করে কাজে লাগায়। কেউ চিৎকার করতে ভরসা পায় না। ওরা পারে না এমন কাজ নেই। বিপদে পড়লে ওরা গুলি পর্যন্ত করতে ভয় পায় না। আর লুঠ করা সোনার গয়না ওরা ভবার মতো লোকের কাছে রেখে টাকা রোজগার করে। এখন সোনার দর দু-হাজার টাকা। ভবারা সাত-আটশো টাকায় কেনে। রাতারাতি গয়না গালিয়ে ভবার মতো দোকানদারেরা বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে চোদ্দ পনেরোশো টাকায় বিক্রি করে।"

অর্চনা দেবী বললেন, "আমার ভয় করছে। ওরা কি শুভ্রদের ছেড়ে দেবে ভেবেছেন। আমার মনে হয়, ওদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া ভাল।"

সৌরেনবাবু বললেন, "যা ভাবছ তাই যদি হয় তো ওরা সব খোঁজ-খবর নিয়ে সেখানেও হামলা করতে পারে।"

রাজীববাবু বললেন, "ঠিক বলেছেন। গত রাতেই আমরা ওদের সব আস্তানায় রেড করেছি। তিন লাখ টাকার মতো জিনিস উদ্ধার করতে পেরেছি।" কথা শেষ করতে না করতেই পত্রিকা অফিসের লোকজন এক এক করে হাজির হতে থাকল।

রাজীববাবুকে ঘিরে বসলেন রিপোর্টাররা। উনি ধীরেসুস্থে সব বলে গেলেন।

একজন রিপোর্টার প্রশ্ন করলেন, "এ ধরনের চুরি-ডাকাতি তো আগেও হত?"

"হ্যাঁ, হত। তবে কী জানেন, সোনার দাম বেড়ে গিয়েই এ-ধরনের ব্যবসায়ীদের লোভ গেছে বেড়ে। শুভ্র যেদিন বলল, ভবা সুস্থ মানুষের মতো সিগারেট টানছিল আর চোদ্দ হাজার টাকার কথা বলছিল, সেদিনও আমার মনে সন্দেহ এত তীব্র হয়নি। পরে ও-ই যখন রাত দুটোর ঘটনা আমাকে জানিয়ে এল তা কিন্তু আর উপেক্ষা করতে পারিনি। তার ওপর রজতের ডায়েরিতেও ভবার প্রসঙ্গে লেখা দেখে সন্দেহ আরও তীব্র হয়। রাতে সকলেই যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখন ভবার কাছ থেকে ওরা গলানো সোনা নিয়ে যেত। কখনও ক্যাশ টাকা দিত, কখনও বা ধারে। লোকে ভাবত, পাগলের কাণ্ড। অথচ, লক্ষ করে দেখবেন, ও দোকানে কণামাত্র জিনিসও নেই। আসলে ভবা খুব চতুর লোক। বড়লোকের ছেলে, পাগল হয়ে গেছে, এই ছদ্মবেশে ও দিনের পর দিন এই ব্যবসা চালিয়ে গেছে। আসলে যত বুদ্ধিমানই হোক, ভবার ভুলটা ওখানেই। বিশ্বাস করুন। সন্দেহ যখন আমারও ঘনীভূত হল, তখনই আমি গোয়েন্দা বিভাগকে অ্যালার্ট করি। ওরা সেইমতো রাতে ভিখিরির ছদ্মবেশে গোয়েন্দা মোতায়েন করে। রাতে মাল পাচার করার সময় হাতেনাতে ওদের ধরে ফেলে এবং আমাকেও খবর দিতে ভোলে না। তারপরের সব কিছুই আমার ইনস্ট্রাকশান মতোই হয়েছে।"

সব সংবাদ সংগ্রহ করে ক্যামেরাম্যানরা শুভ্রর ফোটো তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

শুভ্র বলল, "কাকাবাবু, এ ব্যাপারে আমার একার কৃতিত্ব নেই। আমাদের তিনজনের-ই কিছু-না-কিছু ভূমিকা আছে। প্রথম দিনের ঘটনা আমাকে সন্দিগ্ধ করে, সে-রাতেই ছোটকাকা ভবাকে স্বাভাবিক অবস্থায় দু'জনের সঙ্গে দেখতে পায় আর শেষে রজত দুপুরে ভবাকে শো-কেসের আড়ালে বসে কাজ করতে দেখে। সুতরাং ছবি আমাদের সকলেরই তুলতে হবে।"

রাজীববাবু সহাস্যে রিপোর্টারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা যা ভাল বুঝবেন, করুন।" রিপোর্টাররা ওদের সকলের ছবি তুলে একে-একে চলে গেলেন।

সৌরেনবাবু বললেন, "অনেক হয়েছে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য তৈরি হ। পাশ করলে কী পড়বি ঠিক কর। ডাক্তারি না, ইঞ্জিনিয়ারিং?"

শুভ্র আর রজত একসঙ্গেই বলে উঠল, "ডাক্তারি।"

অমিতজ্যোতি সে উত্তর শুনে মুচকি মুচকি হাসছিলেন শুধু।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

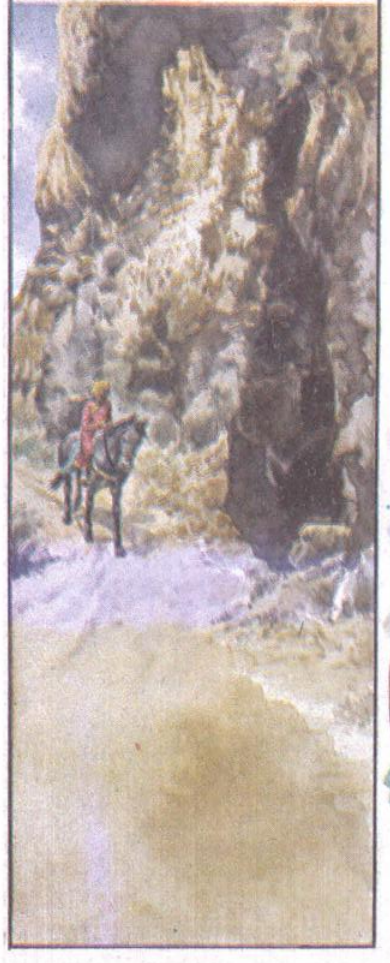

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **সদাশিব** হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

এর পরে আগামী সংখ্যায়)

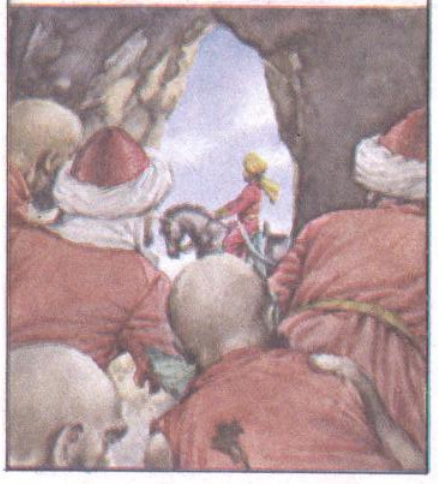

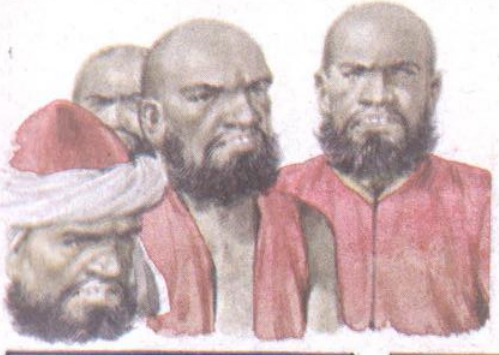

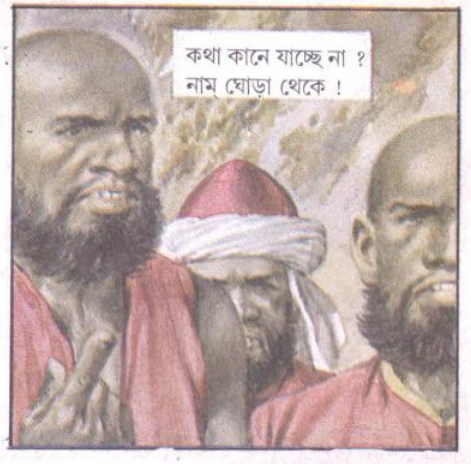

ছবি এঁকেছে **আনন্দকমল মিত্র** (বয়স ১০)

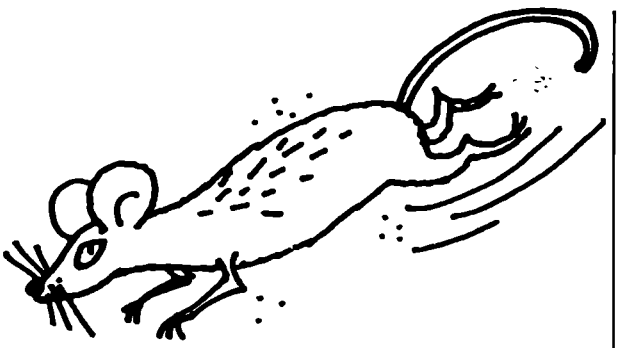

চোর ধরতে গিয়ে

আমাদের পাড়ায় ক'দিন ধরে খুব চুরি হচ্ছে। আমার বাপি অফিসের কাজে বাইরে গেছেন। তাই আমি আর মামণি রাতে খুব সতর্ক হয়ে ঘুমোই।

এক রাতে হঠাৎ একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি মামণিও জেগে গেছেন। ঘরে ছোট পাওয়ারের আলোটা জ্বলছে। আমি আর মামণি খুব সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। সব জানলা দরজাই বন্ধ।

আওয়াজটা এমন, যেন কেউ করাত দিয়ে কিছু কাটছে, সতর্ক ভাবে আবার চারদিকে তাকাতেই বোঝা গেল, একটা জানলার পাশ থেকে আওয়াজ আসছে।

মামণি সাবধানে বালিশের নীচে থেকে টর্চটা বার করে নিলেন, আর আমি নিলাম মাথার কাছে রাখা আমার ক্রিকেট খেলার একটা উইকেট।

পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এলাম মশারি থেকে। আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেলাম জানলাটার কাছে। আশ্চর্য! আওয়াজ অমনি থেমে গেল। আমরা দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার আওয়াজটা শুরু হল। আমরা আবার এগিয়ে গেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আওয়াজটা থেমে গেল। আমরাও আবার স্থির হয়ে গেলাম। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা প্রচণ্ড ভয় নেমে আসছিল।

মামণির অবস্থাও বুঝতে পরছিলাম। আওয়াজটা আবার শুরু হতেই মামণি টর্চটা জ্বাললেন। সঙ্গে-সঙ্গে ঝুপ করে কী যেন একটা জানলা থেকে লাফিয়ে পড়ল। আমি আর মামণি চমকে পিছিয়ে এলাম। দেখি, একটা মস্ত বড়ো গুঁফো ইঁদুর। কীভাবে যেন আমাদের শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তারপর বার হওয়ার রাস্তা না পেয়ে জানলা কেটেই পালাবার মতলব করছিল বোধহয়।

আমি আর মামণি হো-হো করে হেসে উঠলাম। আমাদের আর চোর ধরা হল না।

শান্তনু সেন (বয়স ১২)

কলকাতায় গ্রিন রোজ

স্কুলের ছুটিতে আমরা দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কলকাতার তুলনায় ওখানকার আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমাদের কয়েক দিন সময় লেগেছিল।

হিমালয়ের বুকে গাছপালা আর ফুলের সৌন্দর্যই সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওখানে ক্যাক্টাস প্রজাতির সুন্দর-সুন্দর গাছ দেখা যায়। এক ধরনের গাছ দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। সে গাছের পাতা আর ফুলের পাপড়ি আলাদা ভাবে বোঝা যায় না। গাছের সবুজ পাতাগুলো ফুলের মতো সাজানো।

দার্জিলিং থেকে ফেরার সময় একটা গাছ নিয়ে এলাম কলকাতায় লাগাব বলে। অনেকেই বলেছিলেন, ওই গাছ, যাকে ওখানে 'গ্রিন রোজ' বলে, কলকাতার গরমে বাঁচবে না।

গ্রিন রোজের গাছটিকে এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করার চেষ্টা করতে লাগলাম। প্রথম দু-একদিন বাইরে রাখার পর লক্ষ করলাম গাছের কিছু পাতা ঝলসে হলুদ হয়ে গেছে, কতকগুলো ঝরেও পড়েছে। তখন গাছটাকে সরিয়ে নিয়ে রাখলাম কলঘরের পাশে ঠাণ্ডা জায়গায়। সেখানে কিছুদিন রাখার পর আবার যখন বাইরে আনলাম তখন দেখলাম, বাইরের আবহাওয়াকে মানিয়ে নিতে গাছটার কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না।

আমি এই ভেবে অবাক হচ্ছি যে, গাছও মানুষের মতো এক আবহাওয়া থেকে আর এক আবহাওয়ায় গিয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে!

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১১)

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী পঙ্গু। ছেলে সায়ন স্কুলের ছুটিতে চা-বাগানে এসেছিল। কাছেপিঠে ডাকাতি হচ্ছে। দূরের পাহাড়ে সাংকেতিক আগুনের অর্থ জানে বুধুয়া-বুড়ো। সায়ন যে বেওয়ারিশ ঘোড়ায় উঠেছিল, সেই ঘোড়া তাকে নিয়ে ভুটানের জঙ্গলে ঢোকে। সেখানে সুধাময় সেন বিষাক্ত বিছের কামড় থেকে তাকে বাঁচান। তিনি নাকি নেতাজির ফৌজে ছিলেন, ইংরেজদের হাতে বন্দী হন, পালিয়ে জঙ্গলে দীর্ঘদিন লুকিয়ে আছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা তিনি জানেন না। সায়নকে নিয়ে তিনি যে জংলি উপজাতীয় লোকদের ডেরায় যান, তাদের পোশাকে সেই অগ্নি-চিহ্ন, যা দেখে বুধুয়া-বুড়ো ভয় পেয়েছিল। সুধাময় কি তাদের নেতা ? অন্যদের চোখ এড়িয়ে সায়ন যে গুহায় ঢোকে, সেখানে প্রচুর প্যাকিং বাক্স। মাথায় কেউ আঘাত করায় সে জ্ঞান হারায়। চেতনা ফিরবার পরে সে একটা লতা ধরে গুহা থেকে বেরিয়ে আসে। যে-বৃদ্ধা তার প্রাণ বাঁচায়, সায়নকে সে ইঙ্গিতে পালাতে বলে। দূরে জঙ্গল ভাঙার শব্দ। সায়ন একটা গাছে আশ্রয় নেয়। তারপর···

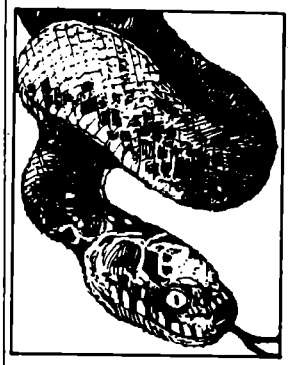

রাত্রে জঙ্গলে নানা রকমের শব্দ হয়। ঘুমন্ত গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রাতজাগা প্রাণীরা নিঃশব্দে চলাফেরা করলেও শব্দ সৃষ্টি হয়। যারা ডালপালা ভাঙছিল তারা যে একদল দাঁতালো শুয়োর সেটা বুঝে কাঠ হয়ে বসল সায়ন। এখন নিচু থেকে কেউ তাকে চট করে দেখতে পাবে না। ডালটা বেশ চওড়া। খুব বেশি নড়াচড়া না করলে ঘুমিয়ে নেওয়া যায়।

মাংসটা খাওয়ার পর শরীর আরও অবসন্ন হয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু যদি ওপর থেকে পড়ে যায়, তা হলে দেখতে হবে না। তবু দুটো ডালের খাঁজে দুটো পা ঢুকিয়ে শরীরটা হেলিয়ে দিল সে মোটা ডালের ওপরে। এভাবে শোওয়া যায় না, কিন্তু তবু আরাম হচ্ছিল। সেই অবস্থায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সায়ন, তা সে নিজেই জানে না। হঠাৎ একটা চিনচিনে জ্বালা হাঁটুর ওপর ছড়িয়ে পড়তেই তড়াক করে উঠে বসতে গিয়ে সামলে নিল সায়ন কোনওমতে। আর একটু হলেই নীচে আছড়ে পড়তে হত। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করে বুঝল সে, জায়গাটা ফুলেছে। কাঠপিঁপড়ে কামড়ালে এইরকম ফোলে। জ্বলছে কিন্তু সহ্য করা যায়। আবছা অন্ধকারে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আর একবার কামড় খাওয়া সুখের হবে না।

সায়ন চারপাশে তাকাল। রাতে গাছের শরীর থেকে অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ বের হয়, কাছাকাছি কোন্ গাছে ফুল ফুটেছে তা টের পাওয়া এখন অসম্ভব। কিন্তু সামান্য ঘুমিয়েও শরীরে যে ক্লান্তি তাই নিয়ে এই গন্ধটা ওর খুব ভাল লাগছিল। তা ছাড়া আবছা নীল একটা আলো-মাখা অন্ধকারে নীচের ঘাস-মাটি অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই সময় তার কাছে অন্যতর শব্দ এল। খটাখট্ খটাখট্, শব্দটা যেন তাল মিলিয়ে বাজছে। সায়ন সতর্ক হল। এবং একটু বাদেই সে অশ্বারোহীকে দেখতে পেল। খুব সতর্ক ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ওপর থেকে সায়ন দেখতে পেল, ওরা সংখ্যায় সাতজন। সেই ন্যাড়া মাথা, কালো পোশাক এবং একই ঘোড়া। এই আবছা অন্ধকারে ওদের মাথাগুলো বীভৎস দেখাচ্ছিল। হৃৎপিণ্ড যেন ধক্ করে গলায় চলে এসেছিল সায়নের। একবার যদি ওরা ওপরে তাকায় তা হলে হয়তো দেখে ফেলবে। ওরা কি এখন তাকেই খুঁজছে ? এরা কি সুধাময় সেনের অনুগত নয় ? নাকি সুধাময় তাকে খুঁজতে এদের পাঠিয়েছেন ! দ্বিতীয়টি ঠিক বলে মনে হল। সুধাময় সম্পর্কে জানতে জানতে সে আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। ঘোড়াগুলো খানিকটা এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এল। লোকগুলো কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। পুতুলের মতো ওরা পাক খাচ্ছে একই জায়গায়। সায়ন ঝুলিয়ে-রাখা পা নিঃশব্দে টেনে নিয়ে মোটা ডালটার আড়ালে যতটা সম্ভব লুকিয়ে রাখছিল নিজেকে। এবং তখনই কনুইয়ে চিনচিনে জ্বালা, পর পর অনেকগুলো। যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়াল সে। পিঁপড়েগুলো এবার একসঙ্গে আক্রমণ করছে। কিন্তু সামান্য শব্দ করলেই আর দেখতে হবে না। সায়নের এইসময় মনে হল, সে ধরা পড়ে গেছে। ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, নইলে জায়গাটা ছেড়ে নড়ছে না কেন ! হয়তো এই অবধি এসেছে এরকম কোনও চিহ্ন ওরা জঙ্গলে পেয়েছে। সায়ন ঠিক করল, যদি ওরা জেনেই থাকে তা হলে বললেই সে নামবে না। ওরা ওকে জোর করে না নামানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ঠিক এই সময় ওপাশের জঙ্গলে একটা আওয়াজ উঠল। মানুষেরই স্বর, কিন্তু চাপা এবং এমন বিকৃত যে চট করে মানুষের বলে মনে হয় না। সায়ন দেখল নীচের অশ্বারোহীরা একটু চঞ্চল হয়ে উঠে সামান্য এগিয়ে থেমে গেল। যেন তারা অপেক্ষা করতে লাগল। এবং দলের কেউ চাপা গলায় ঠিক একই বিকৃত আওয়াজ তুলল। এবার অপর পক্ষ থেকে ঘন ঘন সেই আওয়াজের জবাব দেওয়া হল। সায়নের স্বস্তি হল, সে নিশ্বাস ফেলল। এরা তা হলে তার হদিস পায়নি, অন্য কারও জন্যে অপেক্ষা করতেই এখানে এসেছে। সায়ন গাছের ওপরে বসে দেখল দুটো উঁচু জিনিস উঠে আসছে দূরে। জঙ্গলের মধ্যে তাদের একবার দেখা যাচ্ছে আবার চোখের আড়াল হচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা এসে গেল। দুটো মানুষ পিঠের ঝুড়িতে প্রচুর জিনিস বয়ে নিয়ে এসেছে। জিনিসগুলোর পরিমাণ তাদের এমন আড়াল করে রেখেছিল যে দূর থেকে মানুষ বলে মনে হয়নি। অশ্বারোহীদের দেখামাত্র লোকদুটো জিনিস নামিয়ে বেশ সম্ভ্রমে দূরে দাঁড়িয়ে হাসল। একজন অশ্বারোহী ইঙ্গিত করতে দৌড়ে একটা বাক্স তুলে আনল আগন্তুকদের একজন। বাক্সটা পিচবোর্ডের। এবং তোলার ধরনে বোঝা গেল খুব ভারী নয়। অশ্বারোহীর ইঙ্গিতে আগন্তুক বাক্সটা খুলল। সায়ন ওপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেল। একটা রঙিন বোর্ডের ওপর পর পর সাজানো হাতঘড়ি। লোকটি বোর্ডটি তুলতেই

নীচে আর-একটা বোর্ড দেখা গেল এবং সেখানেও ঘড়ির সারি। অশ্বারোহী মাথা নাড়তে আগন্তুক খুশি-পায়ে ফিরে গেল বাক্সটা নিয়ে। সেটাকে ঝুড়িতে রেখে দু'বার মাথা ঝুঁকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অশ্বারোহী ইঙ্গিত করতে পাশের অশ্বারোহী ঘোড়ার শরীরে ঝোলানো একটা ব্যাগ ছুঁড়ে দিল লোক দুটোর দিকে। ব্যাগটা লুফে নিয়ে সেটার ভেতর থেকে যা বের করল, সায়ন সেটা চিনতে পারল। পোড়া মাংস। লোক দুটোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খাবার পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। অশ্বারোহীদের একজন ছাড়া সবাই বাক্সগুলো ভাগ করে ঘোড়ার ওপর তুলে নিল। যে নেয়নি সে এবার দাঁড়িয়ে রইল এবং অন্যরা ফিরে গেল যে পথে এসেছিল। আগন্তুক দু'জন মাংস ভাগ করে খেতে খেতে অশ্বারোহীটির দিকে তাকিয়ে হাসল। লোক দুটো মধ্যবয়সী, ভাল স্বাস্থ্য, মুখে দাড়ি। পরনে আলখাল্লা-জাতীয় পোশাক। খেতে-খেতে একজন এগিয়ে এল সামনে। যেন খোশগল্প করতে চায় এমন ভঙ্গিতে ঘোড়াটার সামনে এসে হাত নেড়ে কিছু বলতেই অশ্বারোহী চিৎকার করে উঠল। এবং তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটা পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে সামনের জোড়া পা এমনভাবে আকাশে ছুঁড়ল যে লোকটা সাত পা পিছিয়ে দাঁড়াল। সায়ন বুঝতে পারল ওই দু'জনকে পাহারা দেবার জন্যে এই অশ্বারোহীকে রেখে যাওয়া হয়েছে। লোক দুটো যেন আর ভেতরে ঢুকতে না পারে, তাই এই ব্যবস্থা।

মিনিট-পনেরো এইরকম কাটল। তারপর আবার ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠল। সায়ন দেখল, এবার চারজন অশ্বারোহী ফিরে আসছে। তাদের মধ্যে সেই লোকটা আছে, যে প্রথম কথা শুরু করেছিল। চোখের নিমেষে কিছু বলার আগেই লোক দুটো দড়ির ফাঁসে আটকে গেল। সংবিৎ ফিরতেই তারা চিৎকার করে কিছু বলতে চাইল। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করল না অশ্বারোহীরা। টানাটানিতে লোক দুটো মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় তাদের কিছু দূর টেনে নিয়ে যাওয়া হল। সায়নের মনে হচ্ছিল, তার বুকে এক ফোঁটা বাতাস নেই। ওই নির্বাক অশ্বারোহীদের ভঙ্গি দেখে মানুষ বলে ভাবা কঠিন। অমন শক্তিশালী লোক দুটো এখন অসহায় হয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। এরা যদি গাছের ওপরে উঠে আসে তা হলে নিজের কী অবস্থা হবে কল্পনা করতেই শিউরে উঠল সে। লোক দুটো মাটিতে পড়ে চ্যাঁচাচ্ছে আর অশ্বারোহীরা নিরাসক্ত মুখে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে। এই সময় ঘোড়ার শব্দ শোনা গেল। সায়ন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, দুটো ঘোড়া কয়েকটা বাক্স বয়ে আনছে। তার আগে-পিছে আরও তিনটে ঘোড়ায় তিনজন মানুষ বসে। প্রথমে যে আসছে তাকে দেখে চমকে উঠল সায়ন। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল সে ডালটাকে। অপেক্ষারত অশ্বারোহীরা বেশ সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। শুধু নেতা বলে মনে হচ্ছিল যাকে, সে সুধাময়ের ঘোড়ার পাশে নিজের ঘোড়া নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে যা বলল তা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারল না সায়ন। সুধাময় এবার পড়ে-থাকা লোক দুটোর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ জ্বলছিল। সায়নকে অবাক করে দিয়ে সুধাময় পরিষ্কার হিন্দিতে চিৎকার করে উঠলেন, "এই বদমাশ জোচ্চোরের দল, বাকি মাল কোথায় রেখেছিস বল ?"

লোক দুটো যেন আচমকা চিৎকার থামিয়ে বোবা হয়ে গেল। সুধাময় চাপা গলায় বললেন, "চুপ করে থেকে কোনও লাভ হবে না। এর আগের দুই ট্রিপে তোরা জালি মাল গছিয়ে গেছিস। তখন আমি এখানে ছিলাম না, এরাও বুঝতে পারেনি। মালগুলো কোথায় ?"

হঠাৎ শায়িত দু'জন মানুষের একজন উঠে বসে বিপর্যস্ত গলায় বলে উঠল, "আমাদের যা দেওয়া হয়েছে, তাই নিয়ে এসেছি। কী আছে না আছে আমরা জানি না, বিশ্বাস করো।"

সুধাময় হাসলেন, "ঠিক আছে। যারা তোদের পাঠিয়েছে তাদের শিক্ষা হওয়া দরকার। তোরা যদি ফিরে না যাস তা হলে ওরা টের পাবে।" কথা শেষ করে অশ্বারোহীদের ভাষায় কিছু বলতেই একজন নেমে এল। সায়ন কিছু বুঝে-ওঠার আগেই লোকটা চকিতে শূন্যে হাত তুলল। এবং তারপরই এই রাতের গভীর জঙ্গল কাঁপিয়ে আর্তনাদ বেরিয়ে এল একজন শায়িত বন্দীর গলা থেকে। আহত জন্তুর মতো সে ছটফট করতে লাগল, গলায় গোঙানি-মেশানো কান্না। যে লোকটা হাত তুলেছিল সে নির্লিপ্ত মুখে একটা সরু ধারালো ইস্পাতের ফলা গাছের পাতা ছিঁড়ে মুছছিল। হঠাৎ সায়নের মাথাটা ঘুরে গেল। সে চোখ বন্ধ করল। তার দুটি হাত প্রাণপণে গাছটাকে আঁকড়ে ধরল। মাথার মধ্যে অজস্র ফুলকি এবং সমস্ত শরীরে রিমঝিম ভাব, সায়নের কিছু করার ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তার একটা বোধই কাজ করছিল, তাকে কোনওরকমে নিঃশব্দে এই গাছের ডালে বসে থাকতে হবে। সে আর চোখ খুলছিল না। কিন্তু বন্ধ চোখের পাতায় একটা হাত কেমন আঠার মতো সেঁটে আছে, সেটাকে সরাতে পারছিল না। যে হাত বন্দী লোকটির শরীর থেকে ছিটকে ঘাসের ওপর পড়েছে একটু আগে। কী নির্বিকার ভঙ্গিতে অশ্বারোহীটি হাতটাকে শরীর থেকে ছেদ করল। এইসময় সুধাময় হিন্দিতে চিৎকার করলেন, "আমার এই ভাল-মানুষ পাহাড়ি লোকগুলোকে তোরা ঠকাচ্ছিস। অথচ তোদের ঠিকঠাক দাম এরা দিয়ে যাচ্ছে। শোন, তোরা কেউ ফিরে যাবি না। তোদের মালিকরা জানতে চাইলে জানবে তোরা কেউ এখানে আসিসনি, কোনও মাল এরা পায়নি।"

কথা শেষ করে সুধাময় ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন। সমস্ত দলটা একে একে চলে যাচ্ছিল। এইসময় অপর বন্দীটি চিৎকার করে ওদের থামতে বলল। সুধাময় ঘোড়ার মুখ না ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। আহত সহকর্মীটির দিকে এক পলক তাকিয়ে লোকটি মিনতি করে উঠল, "দোহাই তোমার, আমাদের তোমরা মেরো না। আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দাও।"

সুধাময়ের ঘোড়াটা সামান্য এগিয়ে গেল। যেন এইসব প্রলাপের জন্য সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। ওরা চলে যাচ্ছে দেখে লোকটা কেঁদে উঠল চিৎকার করে, "থামো তোমরা, আমি জানি মালগুলো কোথায় আছে। আমি নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এর জন্যে..."

সঙ্গে-সঙ্গে সুধাময়ের ঘোড়াটা মুখ ফেরাল। ধীর পায়ে সেটা এগিয়ে গিয়ে লোকটির পাশে দাঁড়াতেই সে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে ভেঙে পড়ল। সুধাময় গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় ?"

লোকটি হাত তুলল, "এখান থেকে বেশ দূরে, নদীর কাছে। আমাকে নিয়ে গেলে দেখিয়ে দিতে পারব।"

সুধাময় মাথা নাড়লেন। তারপর অশ্বারোহীদের ভাষায় কিছু বলে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন যে পথে এসেছিলেন

সদলে। সায়ন ওঁর চলে যাওয়া দেখছিল। এই সময় আকাশ কাঁপিয়ে একটা আর্তনাদ উঠল। শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল সে। থরথর করে কাঁপতে লাগল তার শরীর।

ওই অবস্থায় কতক্ষণ ছিল সায়ন জানে না। তবে সে গাছের ওপর কোনওরকমে থেকে গিয়েছিল। যখন সে নীচের দিকে তাকাল, তখন কোনও অশ্বারোহী সেখানে নেই। যে বন্দীটি স্বীকার করেছিল অপরাধের কথা, তাকেও দেখতে পেল না সে। কিছুক্ষণ সতর্কভাবে বসে থেকে সায়ন ঠিক করল, গাছ থেকে নেমে আসবে। এভাবে সে আর বসে থাকতে পারছে না। এখন কাছেপিঠে কোনও মানুষ নেই। যতটা সম্ভব এই জায়গা ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। সে ধীরে এবং নিঃশব্দে মাটিতে নামল। তখনই সে দুটো জন্তুকে দেখতে পেল। শেয়াল কিংবা নেকড়ে নয়। কিন্তু ধরনটা ওইরকমের। তাকে দেখে ওরা সরছে না, সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। সায়ন একটা ছোট্ট নুড়ি তুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারতেই ভয় পেল জন্তু দুটো। চট করে জঙ্গলের আড়ালে চলে যেতে সায়ন স্তব্ধ হয়ে গেল। একটি মানুষ পড়ে আছে জঙ্গলের মধ্যে। জন্তু দুটো সেই মানুষটাকে খাচ্ছিল। পোশাক দেখে চোখ বন্ধ করল আবার। তারপর মুখ ফিরিয়ে ছুটতে লাগল উলটো দিকে। সেই বন্দীটি, যাকে আহত করা হয়েছিল, মাল চুরির জন্যে যাকে দায়ী করেছিল সঙ্গীটি, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। একটু আগে ওরই চিৎকার শুনেছে সে। মৃতদেহটাকে এখানেই ফেলে গেছে ওরা। এখন জন্তুরা ছিঁড়ে খাচ্ছে লোকটাকে।

সায়ন প্রাণপণে ছুটছিল। লতায় জড়িয়ে কয়েক বার আছাড় খেল সে। সুধাময় সেন যে কতখানি নিষ্ঠুর সেটা চোখের সামনে দেখে সে শিউরে উঠছিল। এই মানুষটির সঙ্গে সে কয়েক দিন একসঙ্গে ছিল, অথচ এসব ব্যাপার কখনও অনুমান করতে পারেনি।

সায়ন হাঁফিয়ে পড়েছিল। জঙ্গলটা এখানে আচমকা শেষ হয়ে গেছে। খানিকটা ন্যাড়া জায়গা, তারপর আবার জঙ্গলের শুরু। এখনও আলো ফোটার কোনও আয়োজন নেই। ন্যাড়া জায়গাটা সোজাসুজি পার হতে সায়নের খুব ভয় করছিল। যদি কেউ এখানে থাকে তা হলে সহজেই সে ধরা পড়ে যাবে। এতদূর পালিয়ে এসে বোকার মতো ধরা পড়ার কোনও মানে হয় না। সায়ন জঙ্গলের গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আর পা ফেলার জায়গা পেল না। জঙ্গলটা এমন কালো এবং বুনো যে মনে হয় কেউ কোনওদিন সেখান দিয়ে যায়নি। আর ওখান থেকেই পাহাড়টা ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। কী করবে যখন ঠাহর করতে পারছে না, ঠিক তখনই সায়ন পেছনের জঙ্গলে একটা শব্দ শুনতে পেল। যেন ভারী কিছু গাছপালা ভেঙে এগিয়ে আসছে। মানুষ এইভাবে শব্দ করে এগিয়ে আসবে না। আর এখন এই অবস্থায় মানুষ এবং জন্তুর কোনও প্রভেদ তার কাছে নেই।

সায়ন আর দাঁড়াল না। যা হবার হবে এমন একটা ভাবনা তাকে পেয়ে বসল। সে যখন ন্যাড়া জায়গাটা পেরিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকল, তখন আকাশে শুকতারা ফুটেছে। নিশ্বাস

জনপ্রিয়তার নতুনতম নজির

এক লক্ষ কপি ছাপা পূর্ণ হল

সুকুমার রায়ের

একখণ্ডে যাবতীয় ছোটদের রচনা

সমগ্র শিশুসাহিত্য

দাম ১৫·০০

অবিশ্বাসীদের স্তব্ধ করে দিয়ে বার হয়েছিল এই বই, সুকুমার রায়ের সমগ্র শিশুসাহিত্য। ছোটদের জন্য যা-কিছু রচনা করেছিলেন সেই চিরবরেণ্য স্রষ্টা, এই অখণ্ড সংগ্রহে—দুই মলাটের মধ্যে—তাকে ধরে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ছোট-বড় সমস্ত ছড়া, সমস্ত গল্প, সমস্ত কবিতা, সমস্ত নাটক, সমস্ত সন্দর্ভ আর সমস্ত ছবি একটিমাত্র আধারে বিধৃত হয়ে রয়েছে। চমক ছিল দামেও। কম দামে, এমন অবিশ্বাস্যরকমের কম দামে এই বিপুল ঐশ্বর্যের উপহার যে সাজিয়ে দিতে পেরেছিলাম আমরা, তার কারণ, এই কাজকে আমরা একটি ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম,—হাসি ফোটাতে চেয়েছিলাম সকল বয়সের সকল শিশুর মুখে।

সেই ব্রতের উদ্‌যাপন আজ ছুঁয়েছে চূড়ান্ত সার্থকতা। জনপ্রিয়তার সমস্ত নজির তছনছ করে এই সংস্করণের মুদ্রণসংখ্যা আজ স্পর্শ করেছে ১,০০০০০ (এক লাখ)

এক গৌরবমণ্ডিত প্রকাশনা

সুকুমার রায়ের

সমগ্র শিশুসাহিত্য

এতে রয়েছে : আবোলতাবোল, খাই খাই, অতীতের ছবি, অন্যান্য কবিতা, হ য ব র ল, পাগলা দাশু, বহুরূপী, অন্যান্য গল্প, ঝালাপালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, অবাক জলপান, হিংসুটি, চলচ্চিত্তচঞ্চরী, ভাবুক সভা, শব্দকল্পদ্রুম, মামা গো, জীবনী, জীবজন্তু, বিবিধ রচনা, বাল্যরচনা ও অন্যান্য, সেইসঙ্গে রয়েছে ঝালাপালা ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটক দুটির গানের স্বরলিপি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার

সুকুমার রায়ের

সমগ্র শিশুসাহিত্য

এই রচনাসম্ভার পড়তে-পড়তে ছোটরা যেমন সুন্দরভাবে বড় হয়ে উঠবে, বড়রাও তেমনি ফিরে যাবেন সেই ছেলেবেলায় সুকুমার রায়ের চিরায়ত রচনা যাকে সুন্দর ও সুরভিত করে রেখেছিল।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

স্বাভাবিক হতে সময় লাগল তার। সায়ন হাঁটতে গিয়ে একটা পথ দেখতে পেল। পায়ে-চলা কিংবা ঘোড়ায়-চলা পথ বলে মনে হল ওর। কিছুটা দ্বিধা করেও সেই পথ ধরল সায়ন। এবার তার হাঁটতে বেশ সুবিধে হচ্ছে। পথের পাশে পড়ে-থাকা একটা শক্ত ডাল সে কুড়িয়ে নিল। মনে হয় এটাকে কেউ ব্যবহার করেছিল। তার মানে মানুষের নিয়মিত যাতায়াত আছে এই পথে। কিন্তু তারা যখন গুহা ছেড়ে এখানে এসেছিল, তখন অন্য পথ ব্যবহার করেছিল। হয়তো ওই বন্দী দুটো এই পথেই এসেছিল। সায়ন খুব সতর্ক হয়ে হাঁটছিল। জঙ্গলের আশেপাশে অনেক রকম জন্তুর গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আর ওদের নিয়ে চিন্তা করছিল না সে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, তাকে পালাতে হবে। কোনও হিংস্র জন্তুর মুখোমুখি না পড়ে গেলে ওদের ভয় করার কিছু নেই। কিন্তু যে-দৃশ্য একটু আগে সে দেখে এসেছে তারপর ওদের হাতে পড়া মানে ··· জোরে পা চালাতে গিয়ে সায়ন টের পেল, তার পা শক্ত হয়ে আসছে। শিরায় শিরায় টান পড়ছে। এবং তখনই অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল সে। শব্দটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকী, সে যে পথে যাচ্ছে সেই পথেও তার দিকে শব্দটা এগিয়ে আসছে। সায়ন খুব নার্ভাস হয়ে পড়ল। এইভাবে মাটিতে দাঁড়িয়ে-থাকা বিপজ্জনক। সে দৌড়ে একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে এসে দাঁড়াতেই শব্দটা সোচ্চার হল। কোনওরকমে গাছের ওপরে উঠে বসতেই সায়ন হাতিগুলোকে দেখতে পেল। দল বেঁধে ওরা জঙ্গল ভাঙতে-ভাঙতে এগিয়ে যাচ্ছে নীচে। সংখ্যা গোটা-বারো হবে। ওরা চলে যাওয়ার পর আবার শব্দ উঠল। জীবনে প্রথম বাইসন দেখল সে। বাইসনরাও তা হলে দল বেঁধে যাতায়াত করে? ওদের গন্তব্যস্থল হাতিদের মতো। এভাবে এইসময় কোথায় যাচ্ছে ওরা?

সায়ন আকাশের দিকে তাকাল। নীল আকাশে এখন অন্ধকারের ছায়া নেই। তারাগুলোকে বড্ড হলুদ দেখাচ্ছে। রাতের শেষ কিন্তু দিনের শুরু হয়নি। সায়ন আর-একটা ডাল ধরে ওপরে উঠে এল। যে-দিকে চোখ যায় শুধু জঙ্গল আর পাহাড়। দেখতে-দেখতে হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল।

বেশ কিছুটা দূরে একটা ঢালু জায়গার মুখে পাথরের আড়ালে সেই অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে আছে, যে প্রথমে বন্দী দুটোর পাহারায় ছিল। তার হাতের দড়ি চলে গিয়েছে সেই বন্দীটির কোমরে। এই দু'জন ছাড়া চরাচরে আর কেউ নেই। ওরা নড়ছে না, নিঃশব্দে কোনও কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে। সায়ন বুঝল, বন্দীটিকে লুকিয়ে রাখা মালের হদিস দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওর দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, কোমরে দড়ি। কিন্তু ওরা অপেক্ষা করছে কিসের জন্যে?

তারপরেই বুঝতে পারল সায়ন। হাতি এবং বাইসনগুলোর সামনে বোধহয় ওরা পড়তে চায় না। ওদের চলে যেতে দিচ্ছে অশ্বারোহী। লোকটি বলেছিল নদীর কাছে আছে মালগুলো। তা হলে কি ওরা নদীর কাছাকাছি এসে গেছে?

সায়ন দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এল। তারপর নিঃশব্দে দৌড়তে লাগল। অশ্বারোহী এবং বন্দীটিকে হারালে চলবে না। (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

ডাক্তারবাবু বলছেন

হেমন্তকালের খাওয়াদাওয়া

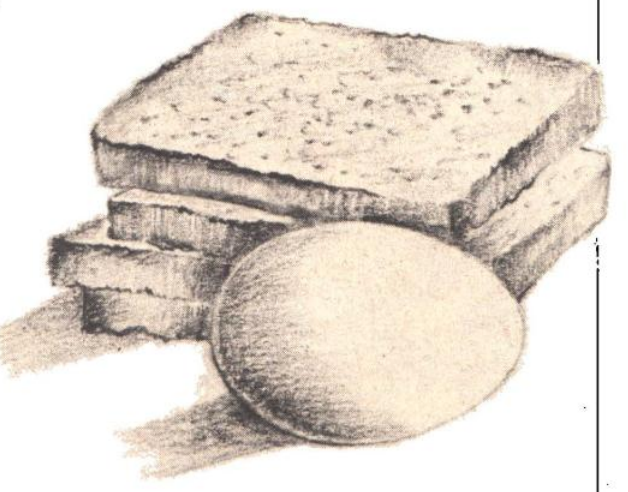

ছবি : পরমেশ পুরকায়স্থ

হেমন্তকালে বাজারে হরেক সবজি আসে। সব শাক-সবজিতেই পুষ্টি ও ভিটামিন আছে, অতএব যে-কোনও তরকারি দিয়ে ভাত খেলেই শরীরে পুষ্টি হবে। যারা ভাত খাও না, রুটি খাবে। যদি পরোটা বা লুচি খেতে ইচ্ছে হয়, তা হলে বাদাম তেল বা গাওয়া ঘিয়ের লুচি বা পরোটা খেতে পারো। তবে রোজ খেয়ো না।

যারা মোটা হতে চাও, এই সময় থেকে খাওয়ার অভ্যেস করতে হবে। মোটা হওয়া বা শরীর ভাল করার সময় এখন থেকে আরম্ভ করে পুরো শীতকাল করতে হবে। গরমকালে বা বর্ষাকালে শরীর মোটা হবে না।

মোটা হবার জন্যে সকাল-বিকেল মাখন খাবে। পাউরুটিতে কিংবা হাতে-করা রুটির সঙ্গেও মাখন মাখিয়ে খেতে পারো। বেশি করে চিনেবাদাম খাবে। মিষ্টির মধ্যে রসগোল্লা সন্দেশ খেতে পারো। ভাজা মিষ্টি, মানে ল্যাংচা, পান্তুয়া, গজা,জিলিপি খেয়ো না। যারা মোটা হতে চাও, তারা দু' বেলা ভাত খাবে, রুটি খাবে না। আলু একটু বেশি করে খাবে, তবে ভাজা নয়, সেদ্ধ।

এই সঙ্গে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। যদি সময় পাও, সকালবেলায় একশো মিটার দৌড়ে নেবে। রোজ দৌড়লে শরীরের কোষগুলো সতেজ হয়ে ওঠে, ফলে কোষের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায়। যেসব খাবারের নাম করলাম, সেগুলো নিয়মিত খেলে কোষগুলি পুষ্ট হয়, আর দেহ সতেজ হয়ে ওঠে।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক (আপাতত তার নাম পঞ্চানন্দ) জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা উদ্ভট-বিজ্ঞানী শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি তাঁর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে গজ-পালোয়ানের কাছে ; আর-এক ভাই ভরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে এক মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন। সন্দিগ্ধ দুই ভাই পালিয়ে যে বাসে ওঠে, তাতে খুন হয় মহারাজার সেক্রেটারি। গজ'র ডেরা চকসাহেবের পোড়োবাড়িতে। সেখানে ঢুকে যে-লোক মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। মধ্যরাতে তিন ছায়ামূর্তি শিবুবাবুর ল্যাবরেটরির দিকে এগোয়। পঞ্চানন্দ ন্যাড়াকে বলে, তারাই গজকে ধরে নিয়ে গেছে। চকসাহেবের বাড়িতে উঁকি মেরে পঞ্চানন্দ যাকে দেখতে পায়, তার ক্ষমতা সীমাহীন। হরিবাবু ছাতে উঠে নীল চাঁদ দেখে কবিতা লেখেন। পঞ্চানন্দ বলে, সেটা উড়ন্ত চাকি। নিঃশব্দে চকসাহেবের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সে, অকস্মাৎ সে আক্রান্ত হয়। ঢ্যাঙা আততায়ীর উপরে পালটা-হামলা চালায় পাহাড়ের মতো অতিকায় তিনটে লোক। তারপর···

জলার ধারে ঢিবির কথা গজ-পালোয়ান ভালই জানত, ঢিবিটার কোনও বৈশিষ্ট্য সে কখনও লক্ষ করেনি। বাইরে থেকে দেখলে সেটাকে একটা ছোটখাটো টিলা বলেই মনে হয়। এর মধ্যে একখানা আস্ত রাজবাড়ি চাপা পড়ে আছে বলে যে কিংবদন্তী শুনেছে সে, তা গজ বিশ্বাস করে না।

কিন্তু আজ এই নিশুত রাতে এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে তাকে কথাটা বিশ্বাস করতে হচ্ছে।

সেদিন চকসাহেবের বাড়ি থেকে পালিয়ে ন্যাড়াদের বাড়িতে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকেই এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যার মাথামুণ্ডু সে কিছু বুঝতে পারছে না।

ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ করে জানালার পর্দাগুলো ভাল করে টেনেটুনে সে একটু ঘরটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। নিজের কাছে লুকিয়ে তো লাভ নেই, শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে একটা জিনিস সে অনেকদিন ধরেই খুঁজছে। এতদিন গোপনে চোরের মতো মাঝরাতে ঢুকে খুঁজেছে, আর সেদিন আলো জ্বেলে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই খুঁজছিল। কিন্তু যে জিনিসটা সে খুঁজছিল, সেটা সম্পর্কে তার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। যতদূর জানে, জিনিসটা একটা টেনিস বলের মতো ধাতব বস্তু। খুবই আশ্চর্য বস্তু সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ভিতরকার কথা আর জানা নেই। সে শুধু জানে, দুনিয়ায় ওরকম বস্তু দ্বিতীয়টি নেই। পাগলা শিবুবাবু সেই বস্তুটা নিজেই বানিয়েছেন না কারও কাছ থেকে পেয়েছেন তাও রহস্যময়। তবে ওই টেনিস বলের জন্য দুনিয়ার বহু জানবুঝওয়ালা লোক পাগলের মতো হন্যে হয়ে ঘুরছে।

বস্তুটা যে ল্যাবরেটরিতেই আছে তা নাও হতে পারে। কিন্তু কোথাও তো আছেই। ল্যাবরেটরিটাই সবচেয়ে সম্ভাব্য জায়গা। আর শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে এত আলমারি, ড্রয়ার, তাক, গুপ্ত খোপ, মেঝের নীচে পাতালঘর আর পাটাতনে গুপ্ত কক্ষ আছে যে সে এক গোলকধাঁধা। খুঁজতে-খুঁজতে মাথা গুলিয়ে যায়, হাঁফ ধরে, ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে।

সেদিন গজ'রও সেরকমই হচ্ছিল। বস্তুটার একটা হদিস করতে পারলেই গজ এ শহরের পাট চুকিয়ে কেটে পড়তে পারে। হাতেও মেলা টাকা এসে যাবে।

আশ্চর্যের বিষয় এই, শিবুবাবুর কাছে যে ওরকম মূল্যবান একটা দরকারি জিনিস আছে, তা তাঁর ছেলেপুলেরা কেউ জানে না। শিবুবাবুর ছেলেগুলো যাকে বলে হাঁদাগঙ্গারাম। একজন কেবল মাথামুণ্ডু পদ্য লিখে কাগজ নষ্ট করে। একজন গাধাটে গলায় তানা-না-না করে সকলের মাথা ধরিয়ে দেয়। ছোটটা কেবল শরীর বাগাতে গিয়ে মাথাটা গবেট করে ফেলছে। এর ফলে আর পাঁচজনের সুবিধেই হয়েছে।

গজ যখন একটার পর একটা ড্রয়ার খুলে হাতড়ে দেখছিল তখন একসময়ে দরজায় খুব মৃদু একটা টোকার শব্দ হল। একটু আঁতকে উঠলেও গজ খুব ঘাবড়াল না। সম্ভবত ন্যাড়া তার খোঁজখবর নিতে এসেছে।

দরজার কাছে গিয়ে গজ সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে, ন্যাড়া নাকি ?"

ন্যাড়া যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল পর মুহূর্তেই। গজ দেখল দরজার দুটো পাল্লার ফাঁক দিয়ে লিকলিকে শিকের মতো একটা জিনিস ঢুকছে। আর শিকটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো নিপুণভাবে ওপরে বেঁকে ছিটকিনি খুলে ফেলল, বাটামটাও নামিয়ে দিল। ঘটনাটা ঘটল চোখের পলক ভাল করে ফেলার আগেই।

গজ নিরুপায় হয়ে দরজাটা চেপে ধরে রেখেছিল কিছুক্ষণ। তার গায়ে আসুরিক শক্তি। গায়ের জোরে সে অনেক অঘটন ঘটিয়েছে।

কিন্তু এ-যাত্রায় গায়ের জোর কাজে লাগল না। ওপাশ থেকে যেন একটা হাতি তাকে সমেত দরজাটাকে ঠেলে খুলে ফেলল।

গজ মেঝেয় ছিটকে পড়েছিল। চোখ চেয়ে যা দেখল, তা অবিশ্বাস্য। হাতিই বটে, তাও একটা নয়, তিনটে। এরকম অতিকায় চেহারার মানুষ সে কখনও দেখেনি। গোরিলার মতোই তাদের চেহারা, তবে রোমশ নয়। পরনে অদ্ভুত জোব্বার মতো পোশাকও আছে। তবে মানুষ তারা হতেই পারে না।

তিনজনেই তাকে কুতকুতে চোখে একটু দেখে নিল। তারপর দুর্বোধ কয়েকটা শব্দ করল মুখে। ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল তার দিকে।

গজ বুঝল, তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তা বলে সে শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ল না। একটা লাফ দিয়ে উঠে সে সামনের গোরিলাটাকে একখানা পেল্লায় জোরালো ঘুষি ঝাড়ল। সোজা

নাকে। তারপর আরও একটা। আরও একটা।

গোরিলার মতো চেহারার লোকটা কিন্তু ঘুষি খেয়ে একটু টলে গিয়েছিল। মুখটা চেপে ধরে একটা কাতর শব্দও করেছিল।

অন্য দু'জন নীরবে দৃশ্যটা দেখে খুব নির্বিঘ্নে এবং নিশ্চিন্ত মুখেই দু'ধার থেকে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এল গজ'র দিকে।

গজ ক্রমাগত ঘুষি চালিয়ে যাচ্ছিল ঝড়ের গতিতে। একবার সে ধোবিপাটে আছাড় দেওয়ার জন্য ডান ধারের দানোটাকে জাপটে ধরে তুলেও ফেলেছিল খানিকটা। কিন্তু অত ভারী শরীর শেষ অবধি তুলতে পারেনি।

দানোগুলো কিন্তু তার সঙ্গে লড়েনি। কিছুক্ষণ তাকে নিরস্ত্র করবারই চেষ্টা করেছিল। তারপর যেন একটু বিরক্ত হয়েই একটা দানো একটা চড় কষাল তাকে।

গজ সেই যে মাথা ঝিমঝিম করে পড়ে গেল তারপর আর জ্ঞান রইল না কিছুক্ষণ।

একসময়ে টের পেল দানোগুলো তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে।

যখন ভাল করে জ্ঞান ফিরল তখন গজ দেখল, সে একটা অদ্ভুত জায়গায় শুয়ে আছে। ঘর বললে ভুল বলা হবে, অনেকটা যেন সুড়ঙ্গের মতো। আবার ইঁটের গাঁথনিও আছে খানিকটা। বিছানা নয়, তবে একটা নরম গদির মতো কিছুর ওপর সে শুয়ে। মুখের ওপর একটা আলো জ্বলছে। বেশ স্নিগ্ধ আলো। কিন্তু আলোটা ইলেকট্রিক বা তেলের আলো নয়। গজ পরে পরীক্ষা করে দেখেছে একটা বেশ নারকোলের সাইজের পাথর থেকে ওই আলো আপনাআপনি বেরিয়ে আসছে।

জ্ঞান ফেরার কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা দানো এসে তাকে ভাল করে আপাদমস্তক দেখল। দুর্বোধ ভাষায় কী একটা বলল। তারপর কোথা থেকে নানা যন্ত্রপাতি এনে তার শরীরে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে কী যেন পরীক্ষা করতে লাগল।

জায়গাটা কোথায় তা গজ বুঝতে পারছিল না। তবে মাটির নীচে কোথাও হবে। ইঁটের গাঁথনির ফাঁকে ফাঁকে মাটি দেখা যাচ্ছে। সোঁদা গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল।

ঘন্টাখানেক বাদে একটা দানো তাকে কিছু খাবার এনে দিল। এরকম খাবার গজ জন্মেও খায়নি বা দ্যাখেনি। সবুজ-মতো চটকানো একটা ডেলা, সঙ্গে রক্তের মতো একটা পানীয়। যে ধাতুপাত্রে খাবার দেওয়া হল তা সোনার মতো উজ্জ্বল।

খিদে পেয়েছিল বলে গজ বিস্বাদ মুখ করে সেই খাবার মুখে দিয়ে কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেল। এত সুন্দর সেই খাবারের স্বাদ যে সমস্ত শরীরটাই যেন চনমনে খুশিয়াল হয়ে ওঠে। পানীয়টিও ভারী সুস্বাদু, বুক ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

খেয়ে গায়ে একটু জোর পেল গজ। উঠে বসল। একটু হাঁটাহাঁটি করল। দেখল, তাকে সুড়ঙ্গে আটকে রাখার জন্য কোনও আগল বা দরজা নেই। ইচ্ছে করলেই সে বেরোতে পারে।

কিন্তু বেরোতে গিয়েই ভুলটা ভাঙল। সুড়ঙ্গের চওড়া দিকটায় ঠিক কুড়ি পা গিয়েই একটা ধাক্কা খেল গজ। সমস্ত শরীরে একটা তীব্র বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল। ছিটকে সরে এসে গজ অনেকক্ষণ ধরে ধাক্কাটা সামলাল। বুঝল, এরা এমন

ব্যবস্থা করেছে যাতে বাতাসে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক বিক্রিয়া ছড়িয়ে থাকে পর্দার মতো।

দানো-তিনটে পর্যায়ক্রমে এসে মাঝে-মাঝে নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে তাকে পরীক্ষা করে আর দুর্বোধ ভাষায় কী যেন বলে। ওদের ভাষা না বুঝলেও গজ এটা টের পায় যে, তাকে নিয়ে দানো তিনটে একটা রিসার্চ চালাচ্ছে। হয়তো পৃথিবীর প্রাণী সম্পর্কেই সেই রিসার্চ। দানো তিনটে যে পৃথিবীর প্রাণী নয় এ বিষয়ে গজ'র আর কোনও সন্দেহ নেই।

সুড়ঙ্গের মধ্যে যেটুকু পরিসর তাকে দেওয়া হয়েছে, তাতে বিচরণ করে গজ বুঝতে পেরেছে, এটা বাস্তবিকই মাটির নীচেকার কোনও ধ্বংসস্তূপ। মাঝে-মাঝে বাইরে থেকে মৃদু একটা জলীয় বাষ্প বয়ে যায় ভিতরে। অর্থাৎ কাছাকাছি জলাভূমি আছে।

গজ আন্দাজ করল, জলার পাশে হয়তো সেই রাজবাড়ির ঢিবিটার গর্ভেই তাকে আটকে রাখা হয়েছে।

গজ লক্ষ করল, তিনটে দানোর হাতেই মাঝে-মাঝে পিরিচের মতো একটা জিনিস থাকে। খুবই উন্নত মানের পিরিচ সন্দেহ নেই। ওইটে হাতে নিয়েই ওরা বৈদ্যুতিক বেড়াজালটা দিব্যি ভেদ করে আসতে পারে।

গজ হিসেব করে দেখল, টানা দুদিন দু'রাত্রি সে দানোদের হাতে বন্দী। দিনরাত্রির তফাত অবশ্য এখান থেকে বোঝা যায় না। শুধু এই উজ্জ্বল পাথরের আলো ছাড়া দিনরাত আর কোনও আলো নেই। মাঝে-মাঝে গজ'র মনে হয় সে দুঃস্বপ্নই দেখছে। আর কিছু নয়।

আজ হঠাৎ গজ'র ঘুমটা মাঝরাতে ভেঙে গেল। সে উঠে বসল। তারপর কেন ঘুম ভাঙল তা অনুসন্ধান করতে চারদিকে একটু ঘুরে বেড়াল সে। আর হঠাৎই টের পেল, সুড়ঙ্গের এক ধারে বিদ্যুতের বাধাটা আজ নেই।

গজ খুব সন্তর্পণে এগোতে লাগল। (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

ধাঁধা

তিন দিনের জন্য বাইরে ঘুরে এল ছোট্কা। অফিসের কাজেই গিয়েছিল। প্লেনে যাওয়া, প্লেনে ফেরা। এর মধ্যে কাজ ছিল মাত্র একদিনের। অন্য দু-দিন বিশ্রাম, আড্ডা, আর কাছাকাছি একটু বেড়ানো।

ছোট্কার কাছে সেই বেড়ানোরই গল্প শুনছিলাম। বেড়ানোর গল্প ছোট্কার মুখে শুনতে দারুণ ভাল লাগে। অভিজ্ঞতার কথা এমন রসিয়ে রসিয়ে বলে ছোট্কা, সেইসঙ্গে এমন ছবির মতো বুঝিয়ে দেয় জায়গাটার চারপাশের অবস্থা, যে মনে হয়, যেন ভ্রমণ নিয়ে একটা সিনেমা দেখছি।

এবার অবশ্য বেড়ানো ছাড়াও আর-এক আকর্ষণ ছোট্কার ভ্রমণে। ছোট্কা নাকি অনেক মজার-মজার জিনিস কিনে এনেছে। কী কিনেছে সেটা এখনও ভাঙেনি। তবে বিশাল একটা প্যাকেট ছোট্কার আলমারিতে যে উঠে গেছে, এ-খবরটা আমাদের কানে পৌঁছতে দেরি হয়নি।

ছোট্কা নিজেই সেই কেনাকাটার কথাটা তুলল। তবে খুব সহজভাবে নয়। ছোট্কা যেমন করে, ঠিক সেভাবে। অর্থাৎ মজার একটা ধাঁধাও জুড়ে দিল সেই প্যাকেটটার গায়ে। আর বলল, যে সব-থেকে আগে ঠিক উত্তর বলবে, সে ওই প্যাকেট থেকে পাবে দু-দুটো উপহার।

প্যাকেটে নাকি রয়েছে খুব সুন্দর সুন্দর পেন, বলপেন আর কলমের কালি। মোট ১০০ টাকার জিনিস। জিনিসের সংখ্যাও ১০০। তা বলে এক-একটার দাম এক টাকা নয়। পেনের দাম প্রতিটি ১০ টাকা। কালির এক-একটা শিশির দাম ৩ টাকা করে। আর বলপেনগুলো দেখতে বাহারি, দামে শস্তা। এক-একটা বলপেন ৫০ পয়সা করে।

দাম তো শুনলে। এবার বলতে হবে ক'টা পেন, ক'টা কালির শিশি আর ক'টা বলপেন কিনেছে ছোট্কা। আন্দাজে, যা-খুশি বললে হবে না, দেখতে হবে ১০০ টাকায় ১০০ জিনিসের হিসেবও যেন মিলে যায়। এটাই প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ যারা রসায়নের ছাত্র তারা তো জানেই এর মধ্যে কী আছে, তুমি কি জানো ?—HIJKLMNO। উত্তর কিন্তু জলের মতো সোজা।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও— **রারচোকাবার**

গতবারের উত্তর ॥ (১) চার ভাই, তিন বোন। (২) কাহারবা। (৩) সম্ভূয়সমুত্থান, মানে সমবেত প্রচেষ্টা।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

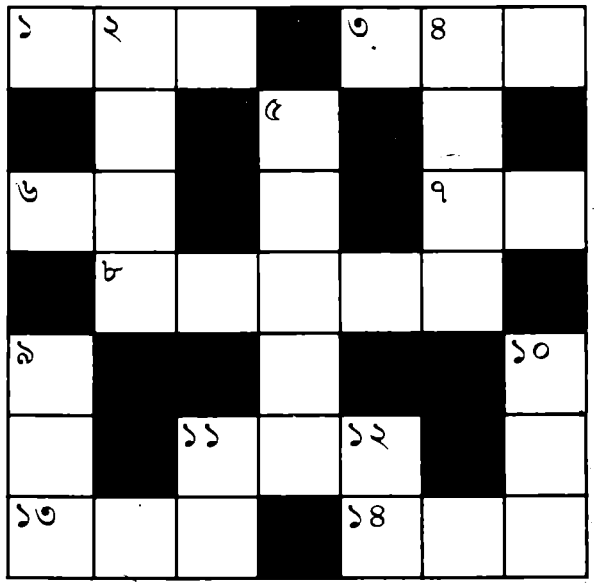

সংকেত : পাশাপাশি : (১) গাড়ি। (৩) বিখ্যাত মরুভূমি। (৬) বাঘ। (৭) বিশেষ্যে মেঠাই, বিশেষণে শক্ত বা নিরেট মূর্খ। (৮) বিস্তারিত বংশ-তালিকা। (১১) হাতের অলংকার। (১৩) অবনীন্দ্রনাথের লেখা একটি বই। (১৪) বজ্র।

উপর-নীচ : (২) শিশুদের বা পাখিদের কোলাহল। (৪) দোকানদারদের বর্ষবরণ। (৫) 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'—এই শপথ নিয়ে যে-সৈনিক যুদ্ধ করে। (৯) মুখ দেখতে চাও ? আমার দিকে চাও। (১০) অর্ধচন্দ্রাকৃতি অলংকার। (১১) বকজাতীয় পাখি, চন্দ্রবিন্দু লুপ্ত হলে অন্য পাখি। (১২) সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, অজয়, দামোদর প্রভৃতিকে কী বলা হয় ?

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ক্র	মে	ল	■	বি	পা	শা
■	ঘ	■	■	■	রা	■
জ	না	র	■	ক	ব	জা
উ	দ	ক	■	পি	ত	ল
■	■	মা	নি	ক	■	■
শ	কা	রি	■	ল	তি	কা
লা	জ	■	■	■	মি	ল

রঞ্জন

মজার খেলা

বারোটা টুথপিক কিংবা ব্যবহৃত দেশলাইকাঠি হলেই দেখানো যাবে এবারের মজার খেলা।

কাঠি বারোটাকে নীচের ছবির মতো একটা ভুল অঙ্কে সাজাও টেবিলের উপর, বন্ধুদের সামনে—

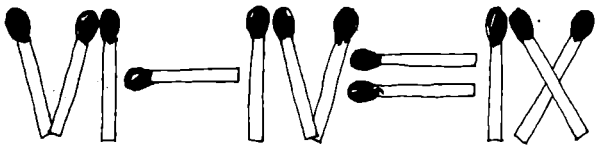

কী লেখা হল অঙ্কটাতে বলো তো ?

ঠিকই ধরেছ, ৬ – ৪=৯। এই অঙ্কটাই রোমান হরফে লেখা।

কিন্তু হরফ যাই হোক, অঙ্কটা যে ভুল এতে কোনও সন্দেহ নেই। এই ভুল অঙ্কটাকেই একটা ঠিক অঙ্কের চেহারা দিতে হবে। আর সেটা করতে হবে মাত্র একটি কাঠি সরিয়ে, ফের অন্য জায়গায় সেটা বসিয়ে।

বন্ধুদের সামনে সেই সমস্যাটা তুলে ধরো। দ্যাখো, বন্ধুদের মধ্যে খুব চটপট এর সমাধান কার মাথায় খেলে যায়।

যার মাথায় আগে উত্তর খেলবে, সেই যে সব-থেকে বুদ্ধিমান সন্দেহ কী। তবে যতক্ষণ না খেলছে ততক্ষণই খেলার মজা।

যে-মুহূর্তে বুদ্ধিমান বন্ধুটির মাথায় উত্তর খেলে যাবে, সে কী করবে সেই মুহূর্তে জানো তো ? সে যা করবে তা দ্যাখো নীচের ছবিতে—

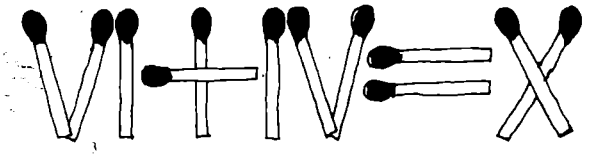

অর্থাৎ ৬+৪=১০। খুবই সহজ ছিল ব্যাপারটা, তাই না ?

মজারু

হাসিখুশি

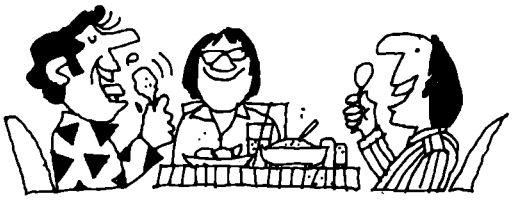

"কাল একটা রেস্টুরেন্টে বিনি পয়সায় খুব খেয়েছি।"

"যাঃ, তাই কখনও হয় নাকি ?"

"কেন হবে না ? বন্ধুই তো বিল মিটিয়ে দিল।"

"উলের চাদর বলছেন, অথচ লেবেলে লেখা রয়েছে 'সুতোর তৈরি'। ব্যাপারটা কী বলতে পারেন ?"

"ঠিকই আছে স্যার। চাদরটা উলের, লেবেলটা সুতোর তৈরি।"

"মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একটা উদাহরণ দিতে পারো ?"

"ছাদে চলুন। পিছন থেকে আপনাকে একটা ধাক্কা দিলেই বুঝতে পারবেন।"

"আপনার তিনটে চশমা কেন অজয়বাবু ?"

"একটা কাছের জিনিস, আরেকটা দূরের জিনিস দেখার জন্য।"

"আর অন্যটা ?"

"আগের দুটোকে খুঁজে বার করার জন্য।"

বিচারক : মনে হচ্ছে, আপনাকে আগে যেন কোথাও দেখেছি।

আসামি : আমি আপনার মেয়েকে গান শেখাতাম ধর্মাবতার।

বিচারক : আসামিকে পাঁচ নয়, দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল।

"কোন্ শব্দটি কোনও সময়ই শুদ্ধ উচ্চারণ করা যায় না ?"

"অশুদ্ধ শব্দটি।"

"আমি রোজ একটা-না-একটা ভাল কাজ করি।"

"আজ কী ভাল কাজ করেছ বুকাই ?"

"মা আমাকে জোলাপ খেতে দিয়েছিলেন। আমি ওটা ভাইকে খাইয়ে দিয়েছি।"

ছবি : দেবাশিস দেব

এমন সাদা, যেন নতুন!

ধোলাইয়ের পর ধোলাই...প্রতি ধোলাই!
পাওয়ার প্যাক্‌ড সার্ফ -এর ধোলাই এমন সাদা, যেন নতুন!

প্রতিটি শার্ট, প্রতিটি চাদর রাখে তেমনিই তাজা, তেমনিই ধবধবে সাদা.....যেন সদ্য কেনা প্যাকেট থেকে বার করা।

কারণ, পাওয়ার প্যাক্‌ড সার্ফ এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো..... অনেক শক্তিশালী, অনেক রক্ষাকারী। এতে রয়েছে এমন শক্তি যা কাপড়ের গভীরে পৌঁছে সাফ করে, আর এখন এতে ফেনাও রয়েছে অনেক বেশী।

সার্ফ কাপড়ের বেয়াড়া ময়লাও তুলে বার করে দেয় – তাই শুভ্রতাও হয় দীর্ঘস্থায়ী—আর, সার্ফ কাপড় রাখে সুরক্ষিত.....সবসময় নতুনের মত। সাদা, রঙীন, বিশিষ্ট বা আটপৌরে—সবকিছুকেই সার্ফ করে রাখে—সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে সাদা.....নতুনের মত সদাসর্বদা!

ধোলাইয়ের তো হাজার পাউডার আছে, কিন্তু পরিবারের সবার জামাকাপড়ের জন্যে আপনার ভরসাযোগ্য হ'ল – একমাত্র সার্ফ!

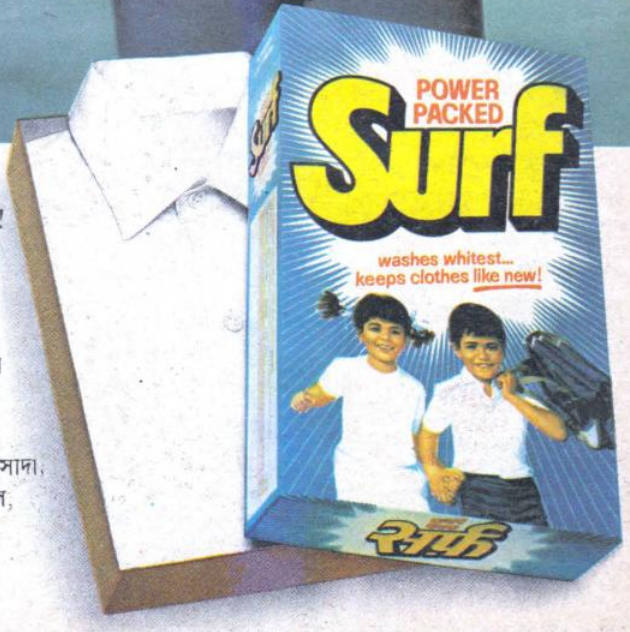

সার্ফের ধোলাই সবচেয়ে সাদা, কাপড় নতুন দেখায় সদা!

হিন্দুস্তান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS SU 317:2720 BG

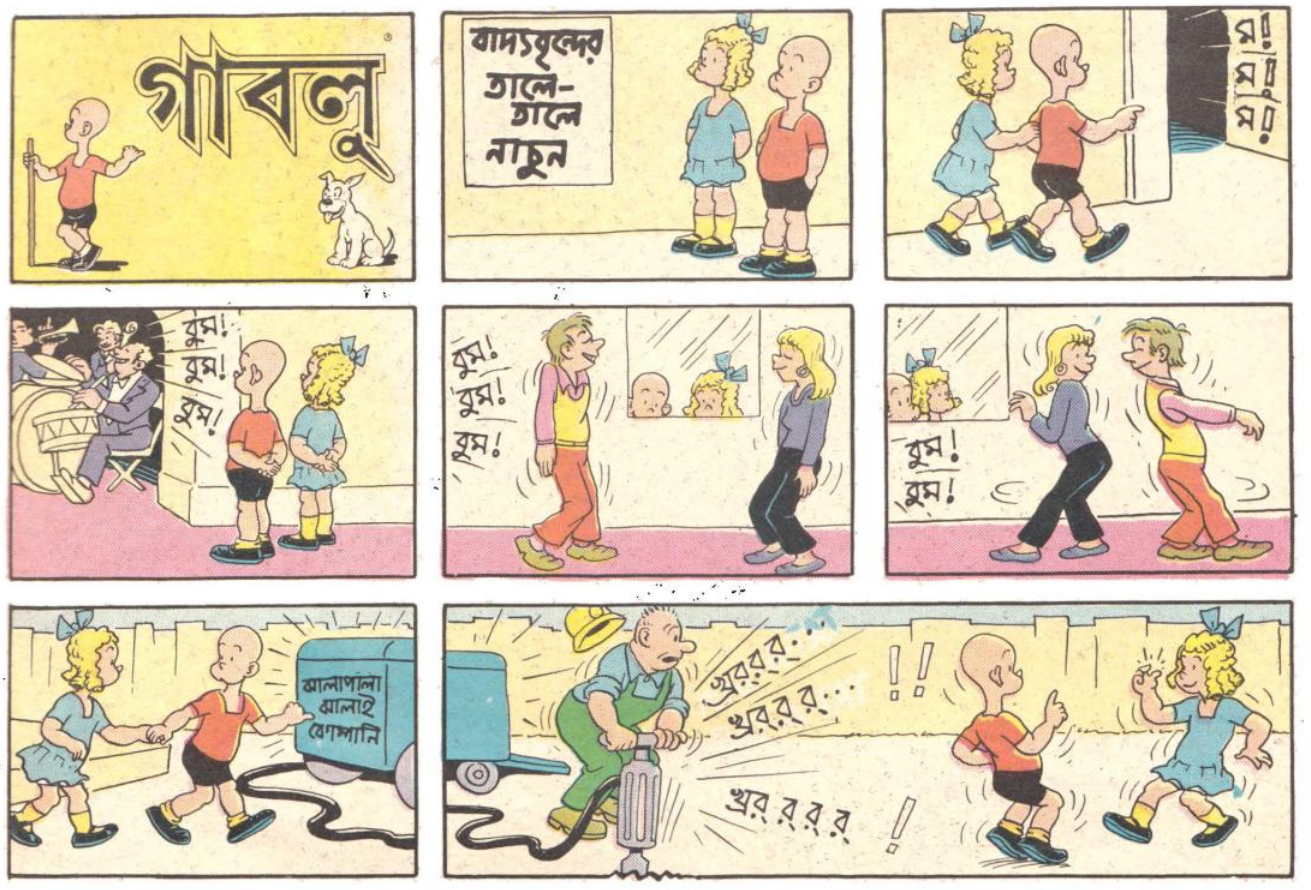

গাবলু
বাদ্যবৃন্দের তালে-তালে নাচুন
ম! ম! ম!
বুম! বুম! বুম!
বুম! বুম! বুম! বুম!
বুম! বুম!
ঝালাপালা মালাই কোম্পানি
খররর...
খররর...
খর র র র
!!
!

গাবলু
এই চারাগাছ চটপট বেড়ে যায়
ফুলের দোকান
এই চারাগাছ চটপট বেড়ে যায়
ফুলের দোকান

বরদলুই ট্রফি মহমেডানের

অশোক রায়

৩৪তম লোকপ্রিয় বরদলুই ট্রফি জিতল কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং। ফাইনালে তারা গোয়ার সালগাঁওকর ক্লাবকে ১—০ গোলে হারিয়ে ট্রফি তুলল ঘরে। এর আগে মহমেডান চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল '৬৯, '৭০ এবং '৮৩ সালে।

মোহনবাগান যোগ না দেওয়ায় বরদলুই ট্রফির যাবতীয় আকর্ষণ কলকাতার ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডানের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়। '৭৮ সালে ট্রফি জেতার পর দীর্ঘ সাত বছর ইস্টবেঙ্গল গুয়াহাটিতে খেলতে যায়নি। এবার এশীয় ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়ান এবং কলকাতার লিগবিজয়ী ইস্টবেঙ্গল যোগদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ওখানকার সংগঠক এবং ফুটবল-অনুরাগীদের নিশ্চিত ধারণা জন্মায় বাজিমাত করবে তারাই। কিন্তু কার্যত তা হয়নি ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের নিজেদের দোষে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল গ্রুপ লিগের প্রথম খেলা ১—১ হতেই মনে সন্দেহ জমতে শুরু করে, শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল কি চ্যাম্পিয়ান হতে পারবে? পরের ম্যাচে শিলং একাদশকে ৯—০ গোলে হারালেও, দুর্বল দলের বিরুদ্ধে জয় ইস্টবেঙ্গলের খেলাকে স্বস্তিদায়ক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গল গ্রুপে শীর্ষস্থান নিয়েই অবশ্য সেমিফাইনালে ওঠে।

ওদিকে মহমেডান এবং সালগাঁওকর সেমিফাইনালে পৌঁছয় যথাক্রমে ১ ও ২ নম্বর স্থান নিয়ে।

প্রথম সেমিফাইনালেই অঘটন ঘটাল সালগাঁওকর। ভারত-চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গলকে তারা প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে দিল ১—০ গোলে হারিয়ে। গোটা ম্যাচটা ইস্টবেঙ্গল দুর্দান্ত ফুটবল খেলল, অজস্র গোলের সুযোগ তৈরি করল। কিন্তু খেলার আসল জিনিস যেটা সেই গোলটাই তারা করতে পারল না। ফরোয়ার্ডরা এমন সব গোলের সুযোগ নষ্ট করলেন যা ভাবা যায় না। তবে সালগাঁওকরের গোলরক্ষক ব্রহ্মানন্দের কথাও এই প্রসঙ্গে বলতে হবে। অসাধারণ গোলকিপিং করলেন তিনি। খেলার শেষে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "নিজের খেলা কেমন মনে হচ্ছে?" মৃদুভাষী ব্রহ্মা (দলের ফুটবলারদের কাছে তাঁর ডাকনাম ব্রহ্মা) জানালেন এটা তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা ম্যাচ। ব্রহ্মা ভাল খেলেছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু তবু বলব খেলায় ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের জন্য দায়ী তাদের ফরোয়ার্ডরা। এই হারে গোল মিস্ করলে কোনও ম্যাচই জেতার আশা করা উচিত নয়।

ওদিক থেকে ফাইনালে উঠল মহমেডান। ফুটবলারদের বদমেজাজ এবং দৃষ্টিকটু আচরণ এই ম্যাচকে প্রচণ্ড বিস্ফোরক অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রেফারির কঠোরতায় বড় গণ্ডগোল হয়নি। ম্যাচে মহমেডান জেতে ২—১ গোলে।

ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে গুয়াহাটি যে এমনভাবে তোলপাড় হবে ভাবা যায়নি। চিমাকে দেখার জন্য হাহাকার পড়ে যায়। 'ইডেন' হোটেলের সামনে শ'য়ে শ'য়ে স্কুলের ছেলেমেয়েরা ভিড় জমিয়েছে স্রেফ একবার চিমাকে দেখার জন্যে।

ফাইনালে কিন্তু কড়া পাহারায় থাকার জন্যে চিমা গোল করতে পারেননি। প্রবীণ ফুটবলার সাব্বির আলি খেলা শেষ হবার মিনিট পাঁচেক আগে অরূপ দাসের পাস বুকে রিসিভ করে চলতি বলেই বাঁ পায়ে প্রচণ্ড ভলিতে গোল করে জিতিয়ে দেন মহমেডানকে।

ফাইনালে সেরা খেলোয়াড়ের এবং টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান যথাক্রমে সালগাঁওকরের ব্রহ্মানন্দ এবং ইস্টবেঙ্গলের দেবাশিস রায়।

সাব্বির আলি (একমাত্র গোলে দলকে জেতালেন)

ইস্টবেঙ্গলের পুজো বোনাস

সুব্রত সিংহ

বরদলুই-এর ব্যর্থতার গ্লানি মুছে দিয়ে ইস্টবেঙ্গল আবার সাফল্যের পথে ফিরেছে। আর সেই সঙ্গে সমর্থকদের পুজোর উপহার হিসেবে দিয়েছে দার্জিলিং গোল্ড কাপ। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, যদিও এই প্রতিযোগিতাকে আমরা দার্জিলিং গোল্ড কাপ বলি, আসলে এই প্রতিযোগিতার নাম গোর্খা ব্রিগেড গোল্ড কাপ। দার্জিলিং জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় এই সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে ব্রিটিশ আর্মি থেকে অবসরপ্রাপ্ত হংকং-এর গোর্খা সৈনিক ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন গোর্খা যোদ্ধাদের সমবেত প্রচেষ্টায়।

এবারের প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান ছাড়া আর কোনও নামী দল না-থাকায় প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেক কমে গিয়েছিল। তবে কলকাতার দুই প্রধান মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রাণ ফিরে এসেছিল। এই দুটি দলই খেলেছে সেমিফাইনাল পর্যায় থেকে। ডবল্ লেগ সেমিফাইনালের প্রথমটিতে ইস্টবেঙ্গল হারিয়েছিল কলকাতারই রাজস্থান ক্লাবকে আর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কলকাতার টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছিল মহমেডান স্পোর্টিং।

ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান, দু' দলের কাছেই এই কাপ জয়ের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। একদিকে, মহমেডান এই প্রতিযোগিতায় গতবারের বিজয়ী, তার ওপর সদ্য সদ্য বরদলুইতে চ্যাম্পিয়ান হয়ে সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাদের কাছে এই কাপ জয় ছিল অত্যন্ত জরুরি। আর অন্য দিকে, গতবারের ফাইনালে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এবং বরদলুই-এ হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করতে ইস্টবেঙ্গল দলের কাছেও এই প্রতিযোগিতায় জয় খুবই প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলই বাজিমাত করল এবারের লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা জামশিদ নাসিরির দর্শনীয় গোলে মহমেডানকে হারিয়ে। একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করেও একটির বেশি গোল হয়নি কিছুটা ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতায় ও কিছুটা অতনুর দৃঢ়তায়। মহমেডানও দুটি সুবর্ণসুযোগের অপচয় করেছিল। ওই দুটি গোলেরই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন ক্লাবের 'স্বার্থপর' বদনামে খ্যাত চিমা ওকেরি। তবে যোগ্য দল হিসেবেই ইস্টবেঙ্গল কাপ জিতেছে।

ইস্টবেঙ্গলের এই সাফল্য এ মরসুমে এ পর্যন্ত তাদের চতুর্থ সাফল্য। এর আগে তারা ফেডারেশন কাপ, কলম্বোয় এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপ জিতে কোকা-কোলা ট্রফি ও ঘরোয়া লিগ পেয়েছে। এ ছাড়া এই প্রতিযোগিতায় ছ'বার ফাইনালে উঠে চতুর্থবার তারা

জামশিদ নাসিরি (দর্শনীয় গোল)

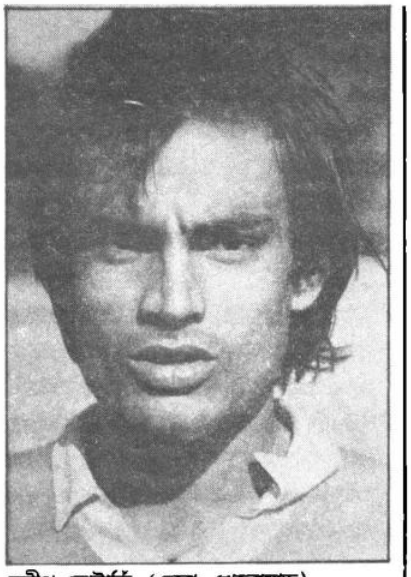

সুদীপ চ্যাটার্জি (সেরা খেলোয়াড়)

এই কাপ জিতল। দু'বার এককভাবে ও দু'বার যুগ্মভাবে। তাদের দলেরই সুদীপ চ্যাটার্জি পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান।

ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান প্রতিযোগিতায় খেলতে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিযোগিতার চেহারাই পালটে গিয়েছিল। দর্শকরাও উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন ভারতের এই দুই নামী দলের কাছে উন্নত মানের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলা দেখার প্রত্যাশায়। বিশেষ করে, এই দুটি দল যখন ফাইনালে মুখোমুখি হল তখন পাহাড়ি এলাকার ফুটবল-অনুরাগীদের এই দুই দলের তীব্র লড়াই দেখার প্রত্যাশাটা স্বাভাবিকভাবেই আর একটু বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দর্শকদের সেই প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেনি ভারতের অন্যতম সেরা দল দুটি।

পুজোর আগে এত বড় সাফল্য পেয়েও কিন্তু ইস্টবেঙ্গল জয়োল্লাসে মেতে উঠতে পারেনি তাদের অধিনায়ক বলাই মুখার্জি মারাত্মক ধরনের আঘাত পাওয়ায়। এর ফলে অবশ্য অপ্রীতিকর ঘটনা বেশি দূর গড়ায়নি। সবচেয়ে প্রীতিকর ঘটনা হল, অবস্থার সামাল দিতে এগিয়ে এসেছিলেন 'মাথা-গরম' দুই খেলোয়াড় দেবাশিস রায় ও চিমা। শেষ বাঁশি বাজার পরই দু' দলের খেলোয়াড়রা একে অপরকে আলিঙ্গন করে একটি সুনজির স্থাপন করেছিলেন। ফুটবলে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করার পক্ষে এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সস্তা পাউডারগুলো ন্যাটের মত পরিস্কার তো করেই না, ভালো জামাকাপড় নষ্ট করে

ন্যাটের অনেক গুণ। তাই তো সুগৃহিণীর কাছে তার এত কদর। বিশেষ জার্মান পদ্ধতিতে তৈরি ন্যাট ডিটার্জেন্ট পাউডারের দানাগুলি হাল্কা অথচ ময়লা ধোওয়ার শক্তিতে ভরপুর। সেইজন্য ওজন অনুপাতে অনেক বেশি পাউডার আপনি পান। তাছাড়া সাধারণ পাউডারে যতটা সোডা-অ্যাশ থাকে ন্যাটে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। ফলে জামাকাপড় নষ্ট হয় না কাপড়কাচা হাতও যত্নে থাকে। সাধে কি বলি–

এতটুকু ন্যাটের ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

A Kusum Product | আস্থার সঙ্গে কিনুন

GK&E.C85.43

দলীপ ট্রফি পশ্চিমাঞ্চলের

বজ্রসেন

ফাইনালে গতবারের বিজয়ী দক্ষিণাঞ্চলকে ৯ উইকেটে হারিয়ে দলীপ ট্রফির সুবর্ণজয়ন্তী বছরে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করল পশ্চিমাঞ্চল। দলীপ ট্রফির এই পঁচিশ বছরের প্রতিযোগিতায় পশ্চিমাঞ্চল সাফল্য পেল এগারোবার। এই মরসুমে পশ্চিমাঞ্চলের এটি দ্বিতীয় সাফল্য। এর আগে তারা সীমায়িত ওভারের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা দেওধর ট্রফিতে উত্তরাঞ্চলকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছিল। এবারের দলীপ ট্রফির ফাইনালে তারাই ছিল ফেভারিট। দুটি দলেই ছিল বেশ কিছু অভিজ্ঞ ও তরুণ ক্রিকেটার। কিন্তু সব মিলিয়ে পশ্চিমাঞ্চলই যে শক্তিশালী, সেটা তারা প্রমাণ করেছে।

এবার ফাইনালের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। শারজা ও অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দল গঠনের জন্য নির্বাচকরা এই খেলাটির উপর যথেষ্ট নজর দিয়েছিলেন। অবশ্য ইরানি ট্রফির খেলাকেই নির্বাচকরা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যেহেতু দলীপ ট্রফির ফাইনালের ওপর নির্বাচকরা নজর রেখেছিলেন, সেইজন্য ক্রিকেটাররাও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য। তবে এই লেখা যখন তোমাদের হাতে পড়বে, তখন শারজায় ত্রিদেশীয় রথম্যানস কাপের ফলাফল ও ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছনোর খবর তোমরা পেয়ে যাবে।

যাই হোক, আবার দলীপ ট্রফির খেলায় ফেরা যাক। দলে শিবলাল যাদব, শিবরামকৃষ্ণন ও রঘুরাম ভাটের মতো দক্ষ স্পিনার থাকায় দক্ষিণাঞ্চল অধিনায়ক শ্রীকান্ত 'টস' জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন।

ক্রিকেটে একটা কথা চালু আছে যে, ইনিংসের গোড়াপত্তন যদি ভাল না হয়, তা হলে বড় ইনিংস গড়া খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই কথা সত্যি করতেই বোধহয় তাদের প্রথম চারটি উইকেট চলে গিয়েছিল, বোর্ডে মাত্র ৩৬ রান উঠতে না উঠতেই। যার মধ্যে ছিল ভারতের নবতম আবিষ্কার আজহারউদ্দিনের উইকেটটিও। এই ম্যাচটিকে আজহার বোধহয় যত তাড়াতাড়ি পারেন ভুলতে চাইবেন। তা ছাড়া সম্প্রতি শ্রীলঙ্কাতেও আজহার ব্যর্থ হয়েছেন। তাই আজহারকে ফর্মে ফিরতে হলে অনুশীলনে গভীর মনোনিবেশ করতে হবে। কেননা আজহার ফর্মে ফিরলে লাভ হবে ভারতীয় দলেরই। তবে শেষ পর্যন্ত দলকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন অভিজ্ঞ ও অবহেলিত রজার বিনির একটি মূল্যবান শতরান (১১৫)। সঙ্কটময় মুহূর্তে ব্যাট করতে এসে রণজিৎ খানিলকরকে নিয়ে তিনি যে অতুলনীয় ইনিংস খেলেছিলেন তা বহুদিন মনে রাখার মতো। প্রশংসা করতে হয় খানিলকরেরও। দুর্ভাগ্যবশত তিনি সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় পৌঁছেও

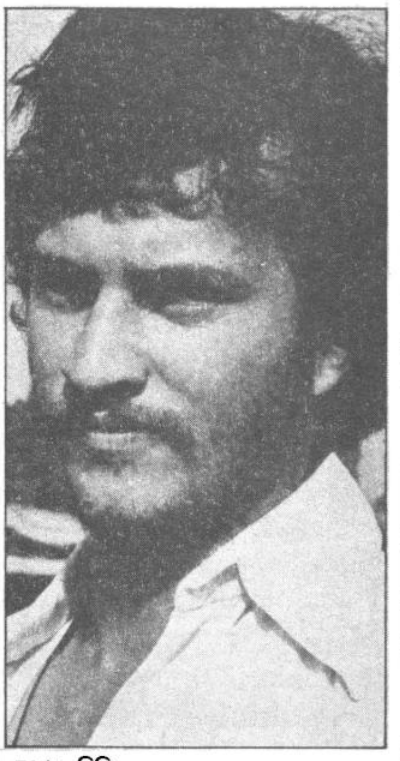

রজার বিনি

মাত্র দু' রানের জন্য সেঞ্চুরি করতে পারেননি।

ভারতীয় দলে গাওস্করের প্রয়োজন এখনও যে কতখানি, সেটা আর একবার প্রমাণ করলেন একটি অনবদ্য সেঞ্চুরি করে। এটি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর পঁচাত্তরতম সেঞ্চুরি, যেটা ভারতীয় ক্রিকেট-ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। এর পর দ্বিতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে এসে দলকে জেতানোর পথে ৪৪টি মূল্যবান রান করে যান। আর বর্তমানে চূড়ান্ত ফর্মে থাকা বেঙ্গসরকরও সেঞ্চুরি হাঁকড়ালেন দক্ষিণাঞ্চলের বোলারদের ছিন্নভিন্ন করে। সন্দীপ পাতিল করেছিলেন ৬৫ রান। এ ছাড়া অধিনায়ক রবি শাস্ত্রী দায়িত্ব নিয়ে অপরাজিত ৫৫টি রান করে দলকে প্রথম ইনিংসে বড়সড় রানে এগিয়ে থাকতে সাহায্য করেছিলেন।

প্রথম ইনিংসে ১৪৮ রানে পিছিয়ে-পড়া দক্ষিণাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসেও কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। প্রথম ইনিংসের ঘাটতি মিটিয়ে তারা মাত্র ৮৯ রানে এগিয়ে যেতে পেরেছিল, যেটা পশ্চিমাঞ্চল মাত্র একটি উইকেট খুইয়েই কুড়িয়ে নিয়েছিল। তবে এরই মাঝে একমাত্র সান্ত্বনা তাদের অধিনায়ক শ্রীকান্তের সেঞ্চুরি।

বোলারদের মধ্যে সফল হয়েছিলেন দু-দলের দুই অফ স্পিনার তরুণ অশোক প্যাটেল ও অভিজ্ঞ শিবলাল যাদব। অশোকের দুই ইনিংসে সংগ্রহ মোট ৮টি উইকেট। আর শিবলালের সংগ্রহ মোট ৭টি, যার মধ্যে এক ইনিংসেই সংগ্রহ ৬টি। ব্যাটিং-এ যেমন চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন আজহার, বোলিং-এ ঠিক সেইরকম ব্যর্থ হয়েছেন লেগ স্পিনার শিবরামকৃষ্ণন।

পরিশেষে এটুকুই বলব যে, আজহার ও শিবরামকৃষ্ণনের ব্যর্থতা ভারতীয় দলের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর। কেননা এই দু'জন উদীয়মান ক্রিকেটারের কাছ থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীরা অনেক কিছু আশা করেন। তবে তাঁদের এই ব্যর্থতা সাময়িক বলেই মনে হয়। কেননা ক্রিকেটারদের এমন খারাপ সময় যায়ই। তাই আমাদের আশা, এই দুই প্রতিশ্রুতিমান ক্রিকেটার এই সাময়িক ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠে ভারতকে আবার সাহায্য করবেন।

সবচেয়ে বিপজ্জনক স্ট্রাইকার

মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য

শুধু কলকাতার কেন, ভারতবর্ষের বিখ্যাত যে-কোনও মাঠের সব চেয়ে বিপজ্জনক স্ট্রাইকার এখন কে, তা নিয়ে নিশ্চয় কোনও দ্বিমত নেই। সেই স্ট্রাইকারটির নাম জামশিদ নাসিরি। তাঁর বিপজ্জনকতার অসংখ্য প্রমাণ ছড়িয়ে আছে গত কয়েক বছরের ভারতীয় ফুটবলের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়। '৮৩, '৮৪, '৮৫ এই তিন বছরেই ফেডারেশন কাপের ফাইনালের গোলদাতা জামশিদ নাসিরি। এ-বছরের লিগে সবচেয়ে বেশি গোলদাতার সম্মানও জুটেছে তাঁরই ভাগ্যে। এমনকি, এ-বছরের সুপার লিগের খেলায় মোট চারটি বড় ম্যাচের মধ্যে একটিতে ওয়াকওভার বাদে বাকি তিনটির দুটিতেই ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে গোলদাতা ছিলেন এই জামশিদ।

ইরানি খেলোয়াড় জামশিদ নাসিরি আজ কলকাতার ফুটবলে এক বিশিষ্ট নাম। দুই পায়ে দারুণ শট, দুর্ধর্ষ হেডিং আর অসাধারণ বল প্লেসিং-এর ক্ষমতা নিয়ে জামশিদ নাসিরি আজ কলকাতা ফুটবলে প্রতিষ্ঠিত নিজের যোগ্যতায়। অথচ ৮০ সালে কলকাতায় প্রথম খেলতে আসা জামশিদ নাসিরির মূল পরিচয়ই ছিল 'মজিদের বন্ধু' হিসেবে। সে-বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব জামশিদ ও খাবাজিকে নিয়েছিল তাদের দলে শুধু মজিদকে পাবার জন্যই। কিন্তু আস্তে আস্তে পরিস্থিতি বদলে যেতে শুরু করল। খাবাজি কলকাতা ময়দানে নিজের যোগ্যতায় স্থান করে নিতে পারলেন না, কিন্তু মজিদ আর জামশিদ পারলেন। মজিদ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হয়ে উঠলেন কলকাতা ফুটবলের তারকা, আর জামশিদ তাঁর ছায়ায় মোটামুটি ভাল খেলোয়াড় হিসেবে পরিগণিত হলেন কলকাতা ময়দানে। '৮০ আর '৮১ ইস্টবেঙ্গলে কাটিয়ে '৮২ সালে পাড়ি জমালেন দুজনে একইসঙ্গে, মহমেডানে। '৮২ থেকে '৮৪ অব্দি মহমেডানে কাটালেন মজিদ আর জামশিদ। ৮৫ সালেও মজিদ মহমেডানে, কিন্তু জামশিদ চলে এলেন ইস্টবেঙ্গলে। এর মধ্যে মজিদ জামশিদের ভাগ্যের চাকা অনেকটা ঘুরে গেছে। মজিদ প্রতিভাবান হলেও নিজের সিরিয়াসনেসের অভাবের ফলে অনেকটা হারিয়ে গেলেন কলকাতা ময়দান থেকে। আর অসম্ভব সিরিয়াসনেস ও নিজের প্রতিভায় জামশিদ হয়ে গেলেন ভারতের সবচেয়ে বিপজ্জনক স্ট্রাইকার।

ইরানের খোরামশাহ শহরে জন্ম জামশিদের। ছেলেবেলায় সেখানেই পড়াশুনো এবং খেলাধুলো শুরু। খোরামশাহ ছেড়ে তেহরানে এসে খেলাধুলোর সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে যান। তখন তিনি খেলতেন তেহরানের শাবাজ ক্লাবে। রাইট স্ট্রাইকার হিসেবে জামশিদের বন্ধু ছিলেন তখন লেফট স্ট্রাইকার মজিদ। ঊনআশিতে মজিদ ও জামশিদ পড়তে আসেন ভারতে। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে সে-বছরই তিনি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে অংশ নেন। সে-বছরই প্রথম আলিগড় ওই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হয়। রোভার্সে খেলার পর ইস্টবেঙ্গলের "ভট্টাচার্য সাহেব" (অরুণ ভট্টাচার্য) ওঁকে এবং জামশিদকে ইস্টবেঙ্গলে আসতে বলেন। তার পরের ইতিহাস তো সবারই জানা।

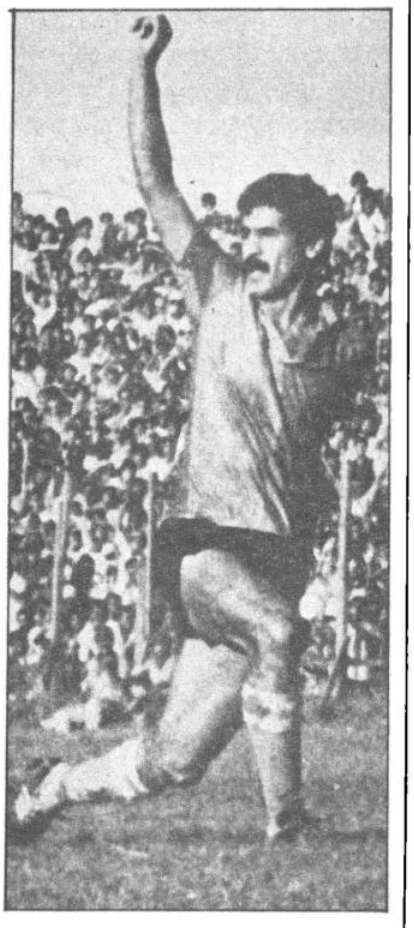

জামশিদ নাসিরি

জামশিদ আজ অনেক পরিণত খেলোয়াড়। ময়দানের এই খেলোয়াড়টি সম্পর্কে এ-বছর তাঁর নিজের দলের কোচ পি কে তো বটেই, অন্যান্য দলের কোচ এবং অধিনায়করাও সপ্রশংস। মোহনবাগানের অধিনায়ক বিদেশ বসু বলেছেন, "জামশিদ নাসিরিই ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ড লাইনের সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্র।" ভারতের আর-এক প্রখ্যাত কোচ অরুণ সিংহ বলেছেন, "ভাল স্ট্রাইকার, ওজনও বেশ। ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস আছে। দুই পায়ে ভাল শট—হেডিং দারুণ ভাল।" আর ভারতের জাতীয় কোচ পি কে ব্যানার্জির মতে "জামশিদ হচ্ছে স্ট্রাইকার, রিয়েল স্ট্রাইকার।"

এ-বছরের গোড়ার দিকে অনেকেই ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "'৮০ থেকে '৮৩ মজিদ এবং '৮৪তে প্রসূন তোমাকে বল জুগিয়েছে। এবার এরা কেউ নেই। কী হবে?" জামশিদ উত্তর দিয়েছিল, "কৃশানু, বিশ্ব, দেবা, বিকাশ, এরা তো আছে।" বলের জোগান ঠিকমতো পেয়েছেন, তাই ভুলচুক না-করে জামশিদই লিগে এবারে সর্বোচ্চ গোলদাতা।

ভারতীয় দলের গোল করার ব্যর্থতার কথা সুবিদিত। সেই বিষয়ে একটা আশার খবর আছে। জামশিদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "যদি তুমি ভারতের নাগরিকত্ব পাও এবং ভারতীয় দলে খেলার জন্য ডাক পাও, তা হলে তুমি কী করবে?" জবাবে জামশিদ বললেন, "যদি আমি ভারতের নাগরিকত্ব পাই এবং ভারতীয় দলে খেলার ডাক পাই, তবে আমি নিশ্চয়ই সেই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখব।"

জামশিদের মতে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় মনোরঞ্জন, কৃশানু, বিকাশ, দেবাশিস, তরুণ, প্রশান্ত।

মামণি ঠিক জানে, কখনো পুড়ে গেলে কি করতে হবে।

মামণি যে শিখেছিল দিদার কাছে

সত্যিই, মামণি আমার সোনা-সোনা। সেদিন কি হয়ে ছিল জানো ? আমার পুতুলের কাপড়টা মামণি ইস্তিরি করছিল। আমি তো দুষ্টু ছটফটে। গরম ইস্তিরিতে হাত দিয়ে ফেলেছি। আঙুল পুড়ে কি জ্বালা। ভাগ্যিস মামণি বার্নল লাগিয়ে দিল। মামণি বলল পুড়ে গেলে দিদাও এই রকম বার্নল-ই লাগাতো। পুতুলসোনা তোমার পুড়ে গেলে আমিও বার্নল লাগিয়ে দেব। ঠিক কিনা মামণি। ঠিক বলেছি বার্নল !

ঘরে-ঘরের ভরসাস্থল...

বার্নল

BL 2078

ANANDAMELA 27 NOVEMBER, 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731

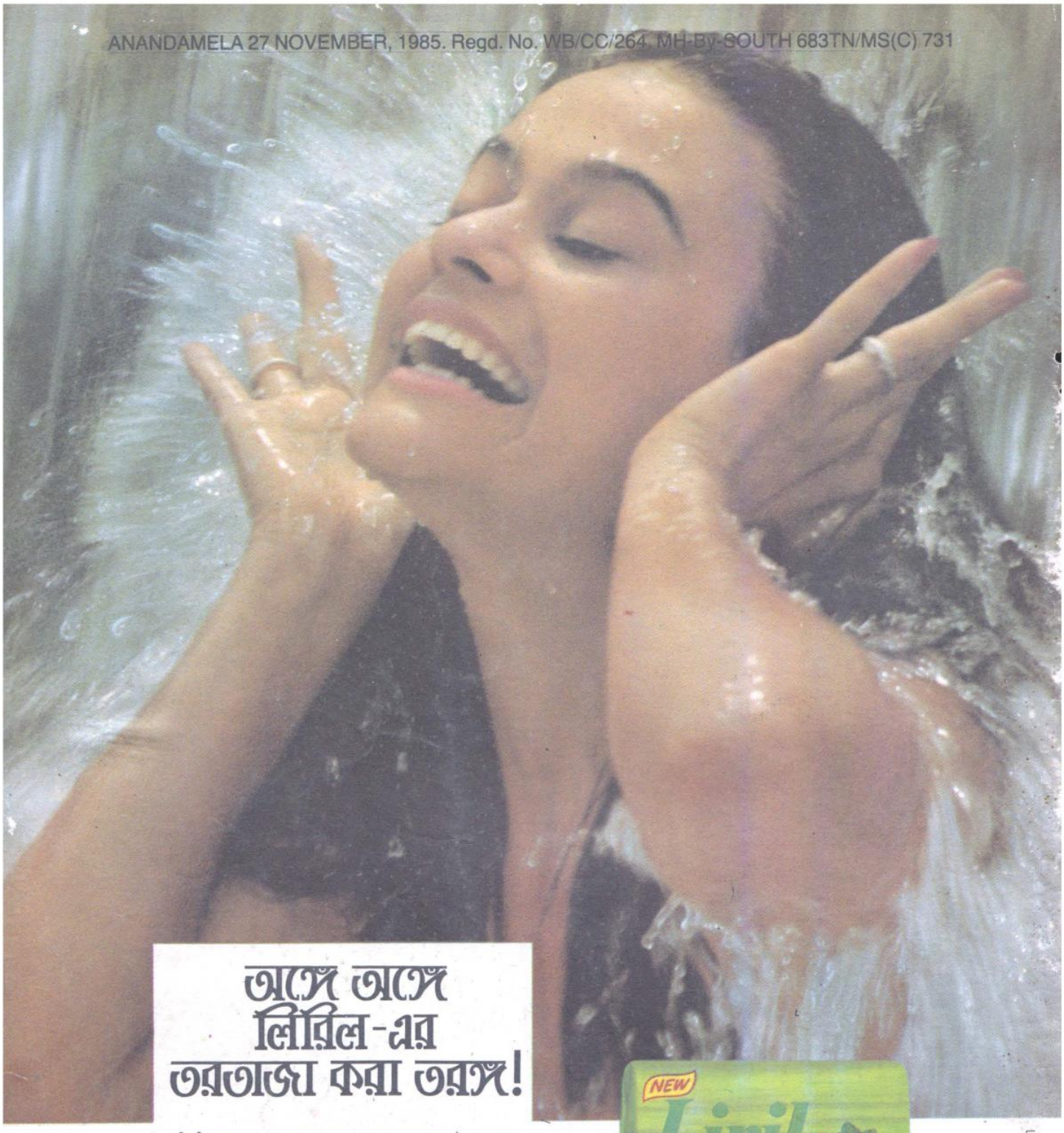

অঙ্গে অঙ্গে লিরিল-এর তরতাজা করা তরঙ্গ!

লিরিল—এবার এক সতেজতা মাখা, রেশ টেনে রাখা অনন্য সুরভিতে—মধুর সুরভি, যেন চনমনে তরতাজা করা মধুর তরঙ্গ—অঙ্গে অঙ্গে ছুঁইয়ে দেয় সেই অনন্য মধুর আবেশ, যার নামটি হ'ল লিরিল-এর সতেজতা!

লিরিল—লেবুর মত চনমনে তরতাজা করা সাবান।

নতুন লিরিল

তরতাজা হবার সাবান

তরতাজা করা এক নতুন অনুভব!

LINTAS LR 46 2719 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন